বাবলি

বুদ্ধদেব গুহ

ইম্ফলে এ সময়ে আনারসটা খুব সস্তা।

অভী দুপুরে বাড়িতে খেতে এসেছিল। খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। খাওয়ার পর বারান্দায় বসে আনারস খাচ্ছিল, এমন সময় ফোনটা বাজলো। কুলো সিং ওর মণিপুরী বেয়ারা-কাম-কুক্-কাম লোকাল গার্জিয়ান ফোনটা ধরেই উত্তেজিত গলায় বলল, বড় মেমসাবকা ফোন।

ফোনটা ধরতেই কমিশনারের স্ত্রী বললেন, অভী বলছ?

—হ্যাঁ।

—শোন, তোমার দাদা বলছিলেন, তোমার নাকি কোহিমা ও ডিমাপুর যেতে হবে অফিসের কাজে পরশু দিন। পরশু দিন না গিয়ে তুমি আগামী কাল ভোরে বেরোতে পারবে? তোমার গাড়ির কণ্ডিশান ভালো আছে তো?

—গাড়ি? আমার তো অফিসের জীপেই যাবার কথা।

—হ্যাঁ। তা তো জানি। কিন্তু একটা বিপদ হয়েছে। আমার দিদির মেয়ে বাবলি, তুমি তো দেখেছ আমাদের বাড়িতে ; ওর পরের সোমবার দিল্লিতে জয়েনিং ডেট, এদিকে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স-এর পাইলটরা নাকি সব স্ট্রাইক করেছেন, এইমাত্র রেডিওতে শুনলাম। তাই তোমাঁর দাদার সঙ্গে কথা বলে তোমাকে ফোন করছি। তুমি কি কাল বেরিয়ে ওকে পরশু কি তার পরের দিন ডিমাপুরে পৌঁছে দিতে পারবে?

অভী বলল, ডিমাপুর থেকে ট্রেনে কলকাতা যেতে তো অনেকদিন লাগবে বৌদি।

—না, না, ও পথে, চা-বাগানে নেমে যাবে। ওখানে আমার দাদা ম্যানেজার। কোম্পানির প্লেনে ওকে কলকাতা পৌঁছে দেবেন উনি। সেখান থেকে প্লেনে দিল্লি চলে যাবে ও। পারবে?

অভী ফোন ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

এ প্রশ্নের কোনো মানে হয় না। ও তাঁকে দাদাই বলুক, আর যাই বলুক, যিনি অফিসের বড় সাহেব, যিনি ওর কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট লেখেন, তাঁর স্ত্রী যতই মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করুন না কেন, এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ। সে ব্যক্তিগত

অসুবিধা থাক আর না-ই থাক। অবশ্য ওর এখানে একার সংসারে অসুবিধা কিছুই নেই। অতএব গলায় উৎসাহ এনে ও বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারবো না কেন? বেশি উৎসাহ যাতে প্রকাশ না পায় সে বিষয়েও সাবধান হল, কারণ তা না হলে উনি ভাবতে পারেন ওর বোনঝির ত্রাতা হতে ও অত্যন্ত উৎসুক।

—পারবে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে ফোনটা একটু ধরো, তোমার দাদা কথা বলবেন।

ঘোষ সাহেব ভারী গলায় বললেন, চৌধুরী, তাহলে তুমি লাঞ্চের পর অফিসে এসে কাজকর্ম যা আছে গুছিয়ে নাও, আর ট্যুর প্রোগ্রামটা আজই আমায় পাঠিয়ে দাও। অ্যাপ্রুভ করে দেবো। আর ইতিমধ্যে তোমার বৌদিকে বলেছি, উনি চা-বাগানে ট্রাঙ্ক-কল বুক করে দিন। বাবলি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে জয়েন করছে, শুনেছ তো? ও বেচারির জয়েনিং দিল্লিতে। না গেলেই নয়।

অভী বলল, না না, আমার কোনোই অসুবিধা নেই। তাছাড়া যেতে তো হতোই। আমি গাড়িটাকে চেক-আপের জন্য গ্যারেজে দিয়েই অফিসে আসছি।

—আচ্ছা। বলে ঘোষ সাহেব ফোন রেখে দিলেন।

দুই

অন্ধকার থাকতে কুলো সিং চা এনে অভীর ঘুম ভাঙালো। রাতে বেশ বৃষ্টি হয়েছিল। এ সময়টা প্রতি রাতেই বৃষ্টি হয় ইম্ফলে। চাদর জড়িয়ে শুতে হয় রাতে। বেশ একটা হিমেল আমেজ।

চান-টান করে তৈরি হয়ে নিল ও। ফাইল-পত্র কুলো সিং সব গাড়িতে তুলে দিলো। কাল বিকেলেই তেল-টেল ভরে গাড়ি ঠিকঠাক করে রেখেছিল। টায়ারগুলোর অবস্থা ভালো নয়।

পথে পটাং করে ফেটে না যায়। দশ বছরের পুরোনো সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি সস্তায় পেয়ে কিনেছিল। একজন অল্পবয়সি ব্যাচেলারের পক্ষে এ গাড়ি যথেষ্ট ভালো। অন্তত খারাপ মনে হয় নি কখনও।

কিন্তু গাড়ি যখন কেনে, তখন একবারও ভাবে নি যে একজন যুবতী মেয়েকে নিয়ে নাগা-হিল্‌সের মধ্য দিয়ে এতখানি পথ এ গাড়িতে যেতে হবে। ভেবেই বেশ নার্ভাস লাগতে লাগল ওর।

বড় সাহেবের গাড়ি নিয়েই যেতে পারত। কিন্তু তার গাড়ির ইঞ্জিন নামান হয়েছে কালই সকালে। জীপে করে ঝড়ে-জলে এতখানি রাস্তা এই পাহাড়ে, মেয়েদের

পক্ষে যাওয়া সত্যিই অসুবিধে।

বড় সাহেবের বাড়ি ঢুকে পড়ল অভী। তখনো সূর্য ওঠে নি। তবে চারপাশ আলো হয়েছে। ঝিরঝির করে হাওয়া দিচ্ছে দেবদারু গাছের পাতায় পাতায়। ওরা সকলে বারান্দাতেই বসেছিলেন। চা খাচ্ছিলেন।

বাবলিকে (যার ভালো নাম দময়ন্তী) অভী একদিন মাত্র দেখেছিল। বড় সাহেবের ছোট ছেলের জন্মদিনে। অনেকের মধ্যে দেখা। হাত জোড় করে নমস্কার করেছিল।

চেহারা এমন নয় যে চোখে পড়ে। বেশ একটু মোটার দিকে, মুখ চোখও যে ভীষণ সুন্দর তা নয়। তবে সব মিলিয়ে বেশ মিষ্টি। অন্যান্য অবাঙালি অতিথিদের সঙ্গে অনর্গল এবং সপ্রতিভ ইংরেজিতে কথা বললেও অভীকে বাংলায় বলেছিল, আপনার কথা অনেক শুনেছি। মাসীমা মেসোমশায়ের কাছে। এই ভিড়ে আলাপ হয় না। পরে একদিন আসবেন। গল্প করা যাবে, কেমন?

বড় সাহেবের এমন সর্বগুণসম্পন্না মোটা এবং মোটামুটি মিষ্টি-শালী মেয়ের সঙ্গে বেশি গল্প করে চাকরির সর্বনাশ করে এমন মূর্খ রোমান্টিক অভী কখনোই ছিল না। তাই ওর চেয়ে বেশি আলাপ হয় নি সেদিন।

পোর্টিকোতে গাড়ি ঢুকতেই ওরা সকলে উঠে দাঁড়ালেন। গাড়ির বুট খুলে দিল অভী। স্যুটকেসটা ওঠানো হল। সঙ্গে বিছানা-টিছানা নেই। আসবার সময় প্লেনে এসেছিলেন। তাই বিছানা আনেন নি।

ঘোষ সাহেব বললেন, কোহিমার লাইন খারাপ। ফোনে পাইনি। সকালেও চেষ্টা করব। আশা করি এম. এল. এ'স হোস্টেলে জায়গা পেয়ে যাবে তোমরা রাত কাটাবার মতো। তাই আর বিছানাপত্রর লটবহর দিলাম না।

মিসেস্ ঘোষ বললেন, অভী দেখো বাবা, সাবধানে নিয়ে যেও। মা-মরা মেয়ে।

তারপর বাবলির দিকে ফিরে বললেন, দেখিস তুই আবার পথে ঝগড়া করিস না, যা ঝগড়াটে মেয়ে তুই।

যাকে একথা বলা হল, সে জবাব দিল না। ওদের প্রণাম করে বাবলি নিজেই সামনের দরজা খুলে বসল।

অভী দরজা বন্ধ করে ঘুরে এসে স্টিয়ারিং-এ বসল। তারপর বাড়ির গেট ছাড়িয়ে ওরা খোলা রাস্তায় এসে পড়ল।

বর্ষার ভোরের মণিপুরের যা নয়ন-ভোলানো দৃশ্য এমন একটা বড় দেখা যায় না। হু হু করে হাওয়া লাগছে চোখে-মুখে। অভী আড়চোখে দেখতে পাচ্ছে ওর সঙ্গিনীর চুল এলোমেলো হচ্ছে। গাল ও কপালময় অনেক ওড়াউড়ি করছে। কিন্তু সে তন্ময় হয়ে পথের দিকে চেয়ে আছে। ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছিল পথকে ও

নিশ্চয়ই ভালোবাসে।

দেখতে দেখতে ইম্ফল শহর পিছনে ফেলে কান্‌কোপ্‌কির দিকে এগিয়ে চলল। এ পথে অভীকে কোহিমা অবধি প্রায়ই যাওয়া আসা করতে হয়। আগে বৈরী নাগারা প্রায়ই অতর্কিতে আক্রমণ করত।

অবশ্য ও আসার পর কোনোদিনও দেখে নি, তখন নাকি বাস ও গাড়ির কনভয় যেতো একসঙ্গে সামনে ও পেছনে অনেক আর্মি ট্রাকের এসকর্ট নিয়ে। এখন সেসবও উঠে গেছে।

তবে নানা জায়গায় ভীষণরকম চেকিং হয়। বিশেষ করে নাগাল্যান্ডে ঢোকার মুখে খুজ্‌মাতে। এবং বেরোবার সময়ও।

এ পথের দু'দিকে যা দৃশ্য তা কাশ্মীরের উপত্যকার দৃশ্যকেও ম্লান করে দেয়। আর বর্ষাকালের তো তুলনা নেই। যেদিকে চোখ যায় সবুজ, শুধু সবুজ। মালভূমি থেকে ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে ওঠা প্রাচীন অথচ প্রসন্ন সব পাহাড়।

ইম্ফল থেকে বেশ কয়েক মাইল চলে এসেছে ওরা।

ইতিমধ্যে অভীর সঙ্গিনী কেবল একটি মাত্র কথা বলেছেন, আমার জন্যে আপনার মিছিমিছি এত কষ্ট করতে হল।

জবাবে অভী বলেছিল, কষ্ট যে হ'লই, এখনো সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হই নি। কষ্ট হলে নিশ্চয়ই জানতে পারবেন।

উত্তর শুনে অবাক মুখ করে অভীর দিকে চেয়ে, মুখ নামিয়ে সঙ্গিনী চুপচাপ হয়ে গেছিলেন। তারপর আর কোনো কথা হয় নি।

পাহাড়ি পথে একটা বাঁক ঘুরতেই ওপাশ থেকে একটা জীপ এমনভাবে এলো যে একটু হলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত।

অভী কোনোক্রমে সামলে নিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বার করে অপসৃয়মান জীপের ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বলল, শালা।

বলেই, লজ্জা পেয়ে বাবলির দিকে চেয়ে বলল, সরি, ভেরি সরি। একা একা গাড়ি চালাই তো। সঙ্গে ভদ্রমহিলা কেউ থাকেন না। অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে।

বাবলি চোখ তুলে একবার অভীর দিকে তাকালো। তারপর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল ও, ও খুব ভয়ে পেয়ে গেছিল। তারপর বলল, আমার খুব চা তেষ্টা পেয়েছে।

অভী হাসল। বলল, আমারও ; চলুন, সামনেই কান্‌কোপ্‌কি। সেখানে গরম চা ও সিঙাড়া খাব।

বাবলির মুখে এবার কথা ফুটল। বলল, এখনো আমরা মণিপুরে আছি না নাগাল্যান্ডে পৌঁছে গেছি?

অভী বলল, নাগাল্যান্ড এখন কোথায়! পৌঁছতে দেরি আছে। কোহিমা পৌঁছতে পৌঁছতে তো বিকেল হয়ে যাবে।

—পথে কী কী জায়গা পড়বে?

—এই রে। আমি কী আর মুখস্থ করে রেখেছি। দাঁড়ান মনে করে দেখি—।

তারপরই বলল, মোটামুটি মনে আছে। এই ধরুন কান্‌কোপ্‌কির পর কারোং—তারপর মারাম। মারামের পর তাদূবী। তাদূবীর পর মাও। মাওতে এসে আমরা নাগাল্যান্ডে ঢুকব। মাও-এর পর খুজ্‌মা। খুজ্‌মার পর জাখ্‌মা। জাখ্‌মাতে এ অঞ্চলের আর্মি হেডকোয়ার্টার্স। জাখ্‌মার পর কোহিমা।

বাবলি বলল, নাগাল্যান্ডের সব জায়গার নামই কি মা দিয়ে?—কেন?

একহাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্য হাত নাড়িয়ে অভী বলল, কেন তা জানি না। হয়তো ওরা খুব মা ভক্ত বলে।

—বাবলি অভীর বলার ধরন দেখে হেসে ফেলল।

দেখতে দেখতে কানকোপ্‌কিতে এসে গেল ওরা। চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে অভী গিয়ে বাবলির দরজা খুলল। বাবলি নামল।

দোকানটা অনেক উপরে পাহাড়ের গায়ে। তারপর অভীর সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে বাবলি চায়ের দোকানটায় পৌঁছলো।

এখানে বেশ ঠাণ্ডা। ইম্ফলেও বেশ ঠাণ্ডাই এখন।

তবে এদিকে ঠাণ্ডাটা বেশি। একটা হাওয়া দিয়েছে কনকনে। দোকানের বেঞ্চে বসতে বসতে অভী বলল, কোহিমাতে বেশ ঠাণ্ডা হবে।

মনে হচ্ছে, বলল বাবলি, বলে চাদরটা ভালো করে টেনেটুনে বসল।

সিঙাড়া ও চা খেতে খেতে বাবলি হঠাৎ বলল, আমার সিঙাড়া খাওয়া উচিত নয়। না?

অভী অবাক হয়ে বলল, কেন?

না, আমাকে সকলে বলে স্লিমিং করা উচিত।

অভী বলল। না না, আপনি তো মোটা নন।

বাবলি চায়ের প্লেটটা নামাল। নামিয়ে বলল, নই, না? আমার জাস্ট স্বাস্থ্য ভালো, তাই না? তারপর চা দিয়ে সিঙাড়া গিলে ফেলে বলল, বিনা কারণে মিথ্যা কথা বলেন কেন?

অভী রীতিমত অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। এমন যুবতী সে জীবনে দেখে নি যে নিজেকে মোটা বলে প্রচার করে আনন্দ পায়। জবাবে কিছু বলল না ও।

এমন সময় একটা বাস এসে কান্‌কোপ্‌কির পুলিশ স্টেশনের সামনে দাঁড়াল।

বাস থেকে পায়জামা-পাঞ্জাবি ও শাল জড়ানো এক বাঙালি ভদ্রলোক নামলেন। বয়স বেশি না।

ভদ্রলোককে দেখেই অভী উঠে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বলল, আরে রাজীববাবু যে, কোথায় চললেন?

ভদ্রলোক দূর থেকেই চেঁচিয়ে বললেন, কোহিমা। আপনি?

আমিও তাই। অল রোডস লিড টু রোম।

বাবলি জিজ্ঞেস করল, ভদ্রলোক কে বলুন তো? কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে।

অভী বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে বলল, একে নিশ্চয়ই দেখেছেন। কলকাতাতেই থাকেন। ইনি ইয়াং জেনারেশানের একজন বেশ নামকরা সাহিত্যিক। এঁর নাম রাজীবলোচন! এঁর বিখ্যাত উপন্যাস "আশ্চর্যপতন" পড়েন নি?

বাবলি উত্তরে কিছু বলল না। কিছুক্ষণ পর নিচের দিকে চেয়ে খুব আতঙ্কিত গলায় বলল, ওমা, ওই দেখুন আপনার রাজীবলোচন ফুল্ললোচনে এদিকেই আসছেন। আপনি নিশ্চয়ই ওঁকে বলবেন, চলুন না, একসঙ্গে গাড়িতেই যাই। বাসে কেন কষ্ট করে যাবেন? তাই না?

অভী হাসল, বলল, হয়তো বলবো। আমি নিজে না বললেও উনিই হয়তো বলবেন, ওই জন্যই বোধহয় উঠে আসছেন।

বাবলি ফিস্‌ফিস্ করে আদেশের সুরে বলল, 'না' করে দেবেন।

—কেন? অবাক হয়ে অভী শুধালো। একজন তরুণ সাহিত্যিকের সঙ্গে এতখানি পথ যাবেন। আপনার ভালো লাগবে না?

—না, আমি সাহিত্যিকদের মোটেই পছন্দ করি না।

—কেন? অভী অবাক হয়ে শুধালো।

—পরে বলব। বাবলি বলল।

ইতিমধ্যে রাজীবলোচন সিঁড়ি বেয়ে ওদের কাছে এসে পৌঁছলেন তাপর সোজা অভীর কাছে এসে বললেন—এখানে কাঁচা লঙ্কা পাওয়া যাবে?

কাঁচালঙ্কা?

হ্যাঁ। নিচের দোকানে মিষ্টি খেয়ে মুখ একেবারে মরে গেছে।

দোকানী একটা কালো-কালো পুরুষ্ট তেল কুচকুচে কাঁচালঙ্কা এনে দিল। রাজীবলোচন কাঁচালঙ্কাটা নিয়ে, লোকে যেমন করে গন্ধরাজ ফুলের বোঁটা ধরে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে পথ হাঁটেন, তেমন করে আঙুলে ধরে চিবোতে চিবোতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন।

সিঁড়ির আধাআধি নামতে-না-নামতেই হঠাৎ একটা আলোড়নের শব্দ শোনা গেল। এবং হাতে কাঁচালঙ্কা ধরা অবস্থাতেই দোকানদারের খোঁটায় বাঁধা একটা সাদা পাঁঠার গলার দড়িতে হোঁচট খেয়ে অবোধ পাঁঠাটার সঙ্গে, গায়ের শালের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে রাজীবলোচন ও পাঁঠা (বাবলি তার নাম জানে না) দুজনেই সিঁড়িতে পড়ে হুড়োহুড়ি করতে লাগলেন।

অভী দৌড়ে গিয়ে রাজীবলোচনকে তুলে ধরে বাসের কাছে পৌঁছে দিয়ে এল।

তারপর ফিরে এসে বাবলিকে বলল, এবার নেমে আসুন, চলুন যাওয়া যাক।

বাবলি আস্তে আস্তে নেমে এল, পাঁঠাটার পাশ দিয়ে আসার সময় বাঁ হাত দিয়ে পাঁঠাটার গায়ে একটু আদর করে দিল।

অভী স্টার্ট করল গাড়ি।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকা বাসটাকে অতিক্রম করে যেতেই বাবলি বলল, "আশ্চর্যপতন"।

অভী প্রথমে বুঝতে পারল না, পরক্ষণেই হো হো করে হেসে উঠল, অনেকক্ষণ ধরে হাসল, বলল, না, আপনি তো সাংঘাতিক মেয়ে।

বাবলি উত্তর না দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

হাসি থামলে অভী বলল, আপনি সাহিত্যিকদের পছন্দ করেন না কেন?

—এমনিই। ব্যক্তিগত কারণে।

—ওঃ! মানে আমাকে নিশ্চয়ই বলা যায় না।

এবার বাবলি মুখ ঘুরিয়ে বলল, নাঃ, তেমন নয়; তেমন ব্যক্তিগত নয়, মানে আমার, আমার ওদের সকলের ওপর দারুণ অভিমান আছে। রাগও বলতে পারেন।

—কেন? কেন?

—ওঁরা জার্নালিজম করেন, যা দেখেন তারই ছবি আঁকেন। ওঁরা নতুন কিছু সৃষ্টি করেন না। আজকালকার এই আপনাদের মতো তরুণ লেখকরা, ওঁদের কারোরই কোনো গভীর বিশ্বাস নেই—ওঁদের কেবল এক-একটি ক্ষণস্থায়ী ভঙ্গী আছে, জুলপীর পরিবর্তনশীল দৈর্ঘ্যের মতো, তাই এঁদের সম্পর্কে কোনো ইন্টারেস্ট নেই।

অভী বলল, বাবা, আপনি যেমন বাংলা বলছেন, ভয় হচ্ছে আপনিও লেখেন-টেখেন।

বাবলি বলল, লিখি না, তবে হয়তো লিখব কোনোদিন।

—কী নিয়ে লিখবেন?

—ঢোলা প্যান্টপরা ঢিলে-ঢালা উপর-চালাকিতে বিশ্বাস করে না এমন ছেলেদের নিয়ে। যাদের নিয়ে কেউ লেখে না। ওরকম রিয়্যাল স্মার্ট ছেলেদের নিয়ে

লিখব।

বাবলি যখন এসব কথা বলছিল, তখন অভী আড়চোখে অ্যাক্সিলেটারের ওপর চাপিয়ে রাখা পায়ের দিকে চেয়ে নিজের প্যান্টের ঘেরটা দেখে নিল। মাঝামাঝি। আশ্বস্ত হল।

অভী গাড়িটাকে আস্তে করল। একটা সিগারেট ধরালো।

ওরা কারোং পেরিয়ে গেল। পথের পাশে হাট। নাগারা পাহাড় থেকে হরিণ আর শুয়োর মেরে এনে হাটে বসেছে। গাছতলায় পাতা পেতে হরিণ আর শুয়োরের মাংস নিয়ে।

লম্বা লম্বা বাঁশের পাইপ খাচ্ছে। বলিরেখাভরা তামাটে কপালে হাত বোলাচ্ছে।

নাগা ছেলেমেয়েদের পায়ের দিকে চেয়ে থাকতে হয়, কী সুন্দর তামাটে শক্ত সুঠাম পা ওদের। পায়ের যতটুকু দেখা যায়, শুধু বার বার দেখতে ইচ্ছে করে।

—আপনি কিন্তু আসল কথাটা এড়িয়ে গেলেন। অভী বলল। ব্যক্তিগত কারণটা বললেন না। কেন সাহিত্যিকদের অপছন্দ করেন?

—বলতে পারি, যদি আপনি দশজনকে বলে না বেড়ান।

—আমার দশজন নেইই-তো বলব কাকে?

—অপছন্দ করি, এই কারণে যে, কোনো সাহিত্যিকই আমার মতো মোটাসোটা মেয়েদের নায়িকা করে কখনো কোনো গল্প লেখেননি। ওঁদের ভাবটা এমন যে, যত বুদ্ধি আর মেধা সব যেন ফিগার-সর্বস্ব সুন্দরী মেয়েদেরই একচেটে। এতেই মনে হয়, যাদের নিয়ে এঁরা লেখেন, বা যা নিয়ে লেখেন তা তাঁরা নিজেরা দেখেন নি বা জানেন না।

এবার অভী হাসল। বলল, আপনার একটা অবসেশান আছে আপনার মোটাত্ব সম্বন্ধে। আসলে কিন্তু আপনি তেমন মোটা নন। আপনি দেখতে অসুন্দরীও নন।

বাবলি মুখ ঘুরিয়ে বলল, আপনি কি আমার কাছে কিছু চান? এত তোষামোদ করছেন কেন? এই বলে বাবলি অনেকক্ষণ অভীর দিকে চেয়ে থাকল।

অভীও মুখ ঘুরিয়ে বাবলির দিকে তাকাল।

অভীর হঠাৎ মনে হল, হঠাৎ-ই মনে হল যে, এই মোটা-সোটা বেশি কথা বলা মেয়েটির মতো বুদ্ধিদীপ্ত ও মিষ্টি মুখ ও দেখে নি আর আগে। অথবা এমন মনোযোগ সহকারেও এর আগে আর কারো মুখের দিকে তাকায়নি।

বাবলিও হয়তো উত্তরের প্রত্যাশা করল না।

অভী পথের দিকে চেয়ে গাড়ি চালাতে লাগল। বাবলি জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

অনেকক্ষণ, বহুক্ষণ, দুজনের কেউই কোনো কথা বলল না। একেবারে চুপ করে রইল। ক্লান্তিতে নয়, বিরক্তিতে নয়, সেই হিম হিম পার্বত্য আবহাওয়ার প্রসন্ন পরজ ভোরে নিছক এক অর্থহীন ভালোলাগায় দুজনে নিঃশব্দে বুঁদ হয়ে রইল।

দেখতে দেখতে ওরা মাও-এ পৌঁছল। এখানে মণিপুরের সীমানা শেষ। নাগাল্যান্ড আরম্ভ। ঠাণ্ডা আস্তে আস্তে বাড়ছে। রোদ উঠছে। কিন্তু রোদে দাঁড়ালে ভালো লাগে।

খুজ্‌মা পৌঁছতেই গম্ভীরদর্শন নাগা গার্ডরা তন্ন তন্ন করে গাড়ি তল্লাশী করল। ড্যাশ বোর্ডে রাখা বাবলির ক্যামেরাটা আর একটু হলে ওরা বাজেয়াপ্ত করেই ফেলেছিল। অনেক করে তাদের বুঝিয়ে সেটা ফেরত পাওয়া গেল। নাগা গার্ডগুলোর মুখের দিকে চেয়ে মনে হয় জন্ম থেকে এরা কখনো হাসে নি। বাবলি ওদের তল্লাশীর পদ্ধতি দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল। ওর মুখ-চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল।

খুজ্‌মা থেকে বেরিয়ে কোহিমার আগে অবধি পথের বাঁ দিকে ইন্ডিয়ান আর্মির ক্যাম্প। প্রচুর জোয়ান আছে এ অঞ্চলে। পথে একজন অফিসারের জীপ গেলে আগে পিছনে দুটি করে আর্মি ট্রাকের এসকর্ট। কখন যে কোথা থেকে কে 'কড়াক পিঙ' করে দেবে কে জানে?

ওরা কেউই আশা করে নি যে অত সকাল সকাল ওরা কোহিমা পৌঁছে যাবে। কোহিমার কাছাকাছি আসতেই বাবলি উঃ আঃ করে নানারকম অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে লাগল। এখনো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চিহ্নস্বরূপ জাপানী ট্যাঙ্ক পড়ে আছে পথের পাশে মূকচিহ্ন গায়ে নিয়ে।

অভী বলল, চলুন, এম-এল-এ'স্ হস্টেলে মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে আমরা সিমেট্রিতে আসব। কোহিমার কবরখানা দেখবার মতো, কত অল্পবয়সী ছেলে যে এখানে শুয়ে আছে তা বলার নয়। আর প্রত্যেকের কবরের উপরে পাথরে কী যে সব লাইন লেখা তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। পড়তে পড়তে চোখ ভিজে ওঠে।

বাবলি বলল, আপনি লোকটা পেসিমিস্ট।

কবরখানা কোনো সুস্থ লোকে দেখে নাকি? যতই সুন্দর হোক না কেন তা, শেষের দিনে তো কবরখানা সকলেরই দেখতে হবে। আমি ওর মধ্যে নেই। তার চেয়ে হাত মুখ ধুয়ে চলুন কোথাও টিপিকাল নাগা খানা খাই। আমার খিদে পেয়ে গেছে। আমার ভীষণ তাড়াতাড়ি খিদে পায়। সেই কখন চারটে সিঙাড়া খেয়েছি। আপনার পাল্লায় পড়ে দেখছি আমার সযত্নে লালিত মোটাসোটা শরীরটা খারাপ হয়ে যাবে।

নাগাল্যান্ড অ্যাসেম্ব্লীর উল্টোদিকে এম-এল-এ'স হস্টেলে গাড়ি রেখে ওরা হাত

মুখ ধুয়ে নিল, অভী বাইরে এসে রোদে দাঁড়িয়ে আরাম করে একটা সিগারেট ধরালো। ততক্ষণে বাবলি শাড়ি পাল্‌টে নিল।

বাবলি যখন নতুন শাড়িতে বাইরে বেরোল (বেগুনী আর গোলাপি জংলা কাজের একটা টেরিকট শাড়ি পরেছিল) তখন রোদের মধ্যে হঠাৎ ওকে নতুন কোনো মেয়ে বলে মনে হল অভীর।

যেন ওর সঙ্গে এতখানি পথ ও গাড়িতে আসে নি। একটা বেগুনী খদ্দরের স্টোল জড়িয়েছিল বাবলি—মধ্যে কাঁচের চুমকি বসানো। বাইরে এসেই বাগানের একটি বেগুনী ফুল ছিঁড়ে নিয়ে খোঁপায় গুঁজলো ও, আর সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করে মালি দৌড়ে এল। বলল, কা কিয়া?

বাবলি ষণ্ডা-গণ্ডা নাগা মালির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শর্মিলা ঠাকুরের মতো হাসল। হাসলে, বাবলির গালে টোল পড়ে। তারপরে বলল, যো কিয়া ; সো কিয়া।

মালি বলল, আবার, হায় হায়, কা কিয়া?

তারপর বাবলি ওর খোঁপায় হাত ছুঁইয়ে মালিকে দেখিয়ে বাংলায় বলল, তোমার ফুলের এর চেয়ে বেশি ইজ্জত আর কি হতে পারতো? দ্যাখো না, কেমন মানিয়েছে।

মালি মেমসাহেবের কাণ্ড দেখে হতবাক, এমন মেয়েছেলে সে এর আগে দেখে নি বলেই তার কপাল কুঁচকানো দেখে মনে হল। অভীও দেখে নি।

বাবলি অভীর কাছে এসে বলল, চলুন এবার ; খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে।

অভী বলল, আপনি একটি পাগলী। রিয়েল পাগলী।

বাবলি ওর দিকে একবার তাকালো, আঙুল দিয়ে ফুলটা ঠিক আছে কি না দেখে নিল, তারপর অভীর পাশে হেঁটে চলল।

বাবলি বলল, কোনো ভালো জায়গায় যেতে চাই না। বুঝেছেন স্যার? আমি একেবারে আসল নাগা খাবার খেতে চাই।

—বাজারের মধ্যে যাবেন? ওসব জায়গায় সাধারণতঃ ভদ্রলোকের মেয়েরা যেতে ভয় পান, যাওয়া উচিতও নয়।

বাবলি বলল, আমি ভদ্রলোকের মেয়ে আপনাকে কে বলল? তাছাড়া আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি। কি করা উচিত না উচিত আমি বুঝি। মেসোমশায়ের এক্তিয়ার ছেড়ে এসে আর এক পিসেমশায়ের খপ্পরে পড়লাম দেখছি।

যে জায়গাটায় ওরা পৌঁছলো, সেটা সত্যিই নোংরা, দোকানটাও নোংরা। অদ্ভুত পোশাকে অদ্ভুতদর্শন সব নাগারা বড় বড় দা নিয়ে ঘোরাফেরা করছে।

অভী বলল, ব্যাঙ খাবেন? না সাপ খাবেন?

কথাটা অভী ভয় পাওয়াবার জন্যই বলল।

বাবলি উত্তরে খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, ব্যাঙ আগে খেয়েছি ; সাপ খাবো, কেমন?

অভী একেবারে নিভে গেল।

অভীর কপাল ভালো, সাপ অথবা ব্যাঙ কিছুই পাওয়া গেল না।

শুয়োরের ডালনা দিয়ে ওরা ভাত খেল, প্রচণ্ড ঝাল। খেতে খেতে দুজনের চোখ দিয়েই জল বেরোতে লাগল—দুজনেই জিভ দিয়ে ফুঃ ফুঃ আওয়াজ করতে লাগল।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাবলি বলল, চলুন আমরা বেরিয়ে পড়ি ডিমাপুরের দিকে। এই পচা হস্টেলে থাকবো না। কেমন স্যাঁতসেঁতে ঘরগুলো—সব সময় মেঝের কার্পেট থেকে তেলাপোকার গন্ধ বেরোচ্ছে। পৌঁছনো যাবে না ডিমাপুরে আজ?

অভী বলল, এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে পারলে পৌঁছনো যাবে। তবে খুব রিস্‌কী হবে।

যদি কোনো কারণে গাড়ি খারাপ হয়ে যায় তো সারা রাত পথেই কাটাতে হবে। পথের একপাশে ডিফু নদী, অন্যদিকে খাড়া পাহাড়, সারা রাস্তাই গভীর জঙ্গল।

—দারুণ হবে, বাবলি বলল—ভাবতেই আমার ভালো লাগছে।

অভী অবাক হয়ে বলল, আপনি আশ্চর্য লোক তো।

—আশ্চর্য কেন? অ্যাডভেঞ্চার আপনার ভালো লাগে না?

—তার মানে? আপনি কি চান যে গাড়িটা খারাপ হয়ে যাক রাস্তায়?

বাবলি অধৈর্য গলায় বলল, আহা, কী মুশকিল! আমি কেন বলব? আমার ইচ্ছায় কি আর কিছু হবে? গাড়ির যা ইচ্ছা তাই হবে।

—আমার কিন্তু ইচ্ছা নয় যে, এমন ঝুঁকি নিয়ে এ রাস্তায় এই রকম গাড়ি নিয়ে আমরা যাই।

বাবলি বলল, সকাল থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনি পুরুষ মানুষ কিনা।

অভীর গলায় রাগ ঝরে পড়ল। বলল, প্রমাণ দিতে পারতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় সবাইকে সব প্রমাণ দেওয়া যায় না।

এবার বাবলি লজ্জা পেয়ে গেল, বলল, আপনি বেশ অসভ্য। মেয়েদের সঙ্গে এভাবে কথা বলে?

অভী বলল, ছেলেদের সঙ্গেও কি কোনো ভদ্রমহিলা এভাবে কথা বলে?

বাবলি না দমে বলল, আমি তো বলেছি, আমি ভদ্রমহিলা নই। আমি একজন মেয়ে, জাস্ট একজন মেয়ে।

—তা-হলে কি ঠিক হল? যাওয়া হবে?

—চলুন। ডিমাপুরে থাকার কি ব্যবস্থা হবে? দুটো ঘর পাওয়া যাবে তো? না

আপনার সঙ্গে একঘরে থাকতে হবে?

বাবলি বলল।

অভী ওর প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশকে উপেক্ষা করে বলল, ওখানে সুন্দর বাংলো আছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের। একজন বাবুর্চি আছে, লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা বদরপুরী মুসলমান। দারুণ রাঁধে। নাম রসিদ আলি। ঘরগুলোও ভালো। আশা করি অসুবিধা হবে না। একটি ঘর পাওয়া গেলে আপনি ঘরে শোবেন—আমি বারান্দায় শোব। ওখানে তো আর এই পাহাড়ের মতো ঠাণ্ডা নয়।

বাবলি বলল, চলুন তাহলে তাড়াতাড়ি। আর দেরি করা ঠিক হবে না। আমার ভাবতেই ভালো লাগছে। রাতে রসিদ আলির হাতের রান্না খাব। এখানে সাপই খাওয়াতে পারলেন না আপনি। কোহিমাতে এলাম, সাপ খেলাম না ; আপনি কোনো কর্মের নয়।

তিন

ওরা যখন কোহিমা থেকে ডিমাপুরের দিকে বোরোল তখন প্রায় দুটো বাজে।

কোহিমা থেকে গড়ানো রাস্তা নেমে গেছে এঁকেবেঁকে। মাইল কয়েক আসার পরই রাস্তাটা ডিফু নদীর পাশে পাশে চলতে লাগল। এসব অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় জঙ্গল এমন ঘন হয় যে তা না দেখলে ঠিক বোঝা যায় না। নদীটা পাহাড়ের উপর দিয়েই বয়ে চলেছে বলে চওড়া নয় মোটেই। সরু, গভীর এবং প্রচণ্ড বেগে ধাবমানা। দু'পাশে নিশ্ছিদ্র জঙ্গল ঝুঁকে রয়েছে।

যখন ওরা কোহিমা ছাড়ে তখন বেশ রোদ ছিল। একটা পাহাড় নামতেই সূর্যটা পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল।

এখন শুধু গাড়ির এঞ্জিনের লো-গীয়ারের শব্দ এবং নদীর একটানা ঝর্‌ঝর। বাবলি নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, কি মশাই? কথা বলছেন না কেন?

—ভাবছি। সব সময় কি কথা বলতে ভালো লাগে।

—কি ভাবছেন?

—ভাবনা এখনো দানা বাঁধে নি। মানে, বলার মতো ভাবনা নয়।

—বাবাঃ হাসালেন। আপনার মতো দানাদার ভাবনার কথা তো কখনো শুনি নি।

—আসলে আমি খুব টেন্স হয়ে আছি—যতক্ষণ না ডিমাপুরে পৌঁছই। পথে কোনোরকমে গাড়ি খারাপ হলে যে কি হবে এই ভাবনাটা ভীষণ নার্ভাস করে রেখেছে আমাকে।

বাবলি তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, আপনি একটুতেই নার্ভাস। মসলা খাবেন?

—নাঃ। অভী উদাসীন গলায় বলল।

—না খেলেন। আমি একাই খাচ্ছি। বলে বাবলি ওর হ্যান্ড ব্যাগ খুলে মসলা বের করে এক মুঠো মসলা খেল।

এমন সময় হঠাৎ অভীর গাড়ি একটা বাঁকের মুখে অদ্ভুত কোঁ-কোঁ-কোঁ একটা আওয়াজ করে উঠল।

মোটা লোককে ঘুমের মধ্যে বোবায় ধরলে তারা যেমন আওয়াজ করেন, তেমন আওয়াজ। বাবলি খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, ও কি? ও কি?—কিসের আওয়াজ?

বলতে বলতেই গাড়িটা বন্ধ হয়ে গেল।

অভীর মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বলল, দেখলেন তো, বললাম আপনাকে—আপনি শুনলেন না, জেদ করলেন।

বাবলি উত্তর দিল না। যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে দরজা খুলে বাইরে নেমে দু'হাত আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, দা-রুণ। সত্যি জায়গাটা দারুণ। আপনার বাহাদুরী আছে। গাড়িটা যদি বা খারাপ করলেন, তাও এমন একটা দারুণ জায়গায়।

অভী উত্তর না দিয়ে বনেট খুলে বনেটের নিচে মুখ ঢুকিয়ে এটা ওটা নিয়ে টানাটানি করতে লাগল।

বাবলি নদীর পাশে একটা পাথরের উপর বসে নদীর মধ্যে ছোট ছোট পাথর ছুঁড়তে লাগল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা এই নদীতে মাছ আছে?

অভী উত্তর না দিয়ে বলল, এ-সি পাম্পের গণ্ডগোল হয়েছে! তেল আসছে না বোধহয়। বলে বনেটের মধ্য থেকে মাথা বের করে বাবলির দিকে তাকাল।

বাবলি একটা ছোট্ট পাথর লোফালুফি করতে করতে বলল, বোধহয় তেল আসছে না। কিন্তু জোঁক নিশ্চয়ই আসছে।

—মানে? বলে অভী ভুরু তুলল।

বাবলি নিরুদ্বেগ শান্ত গলায় বলল, আপনার জুতো বেয়ে দুটো আমার মতো মোটা জোঁক আপনার প্যান্টের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

—কোথায়? কোথায়? বলে অভী লাফাতে লাগল।

তারপর হাঁটু অবধি প্যান্ট গুটিয়ে জোঁক দুটোকে বের করে মাড়িয়ে দিল।

বাবলি বলল, গাড়ির কিছু বোঝেন? গাড়ি কেন খারাপ হয়?

অভী বলল, কিছু বুঝি না বলেই তো বিকেলে কোহিমা থেকে নামতে চাই নি।

বাবলি বলল, গাড়ি চালান, গাড়ির মন বোঝেন না।

—আপনি কিছুর বা কারুরই মন বোঝেন না।

গাড়ির পেছনে গিয়ে গুনে গুনে বারোটা লাথি মারুন আর বলুন আব্রাকাডাব্রা। প্রত্যেকবার লাথি মারার সঙ্গে সঙ্গে বলুন আব্রাকাডাব্রা, দেখবেন গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে।

গাড়ি কি করলে ভালো হতে পারে তা জানা ছিল না অভীর। তাই অগত্যা আস্তে আস্তে গাড়ির পেছনে গেল। একবার ওর মনে হল বাবলি ঠাট্টা করছে না তো?

তারপরই ভাবল এ তো ঠাট্টা করার সময় নয়। অতএব ও লাথি মারল গাড়ির বাম্পারে, মুখে বলল, আব্রাকাডাব্রা।

বাবলি বলল, সত্যি আশ্চর্য আপনি। লাথি মারছেন না যেন মনে হচ্ছে আদর করছেন। জোরে মারুন, খুব জোরে।

অভী জোরে জোরে লাথি মারতে লাগল, আর বলতে লাগল আব্রাকাডাব্রা। আর বাবলি গুনতে লাগল,—এক, দুই, তিন, চার...

বারোটা লাথি মারার পর, বাবলি এবার বলল, বনেট বন্ধ করুন। চলুন যাওয়া যাক।

অভী ভাবল, ও ঠাট্টা করছে। বাবলি আবার বলল, কি? দাঁড়িয়ে দেখছেন কি? চলুন।

বনেট বন্ধ করে অভী এসে স্টিয়ারিং-এ বসল। বাবলি বাঁদিকের দরজা বন্ধ করল। চাবি ঘোরাতেই গাড়ি দিব্যি স্টার্ট নিল এবং তর তর করে চলতে লাগল।

বাবলি, যেন কিছুই হয় নি, এমনিভাবে বাইরে চেয়ে রইল জানালা দিয়ে।

সেই নাগা পাহাড়, ডিফু নদীর ঝরঝরানি শব্দের মধ্যে আসন্ন রাতে অভীর গা ছমছম করতে লাগল। ওর মনে হল ও কোনো ডাইনীর কবলে পড়েছে। গাড়ি চালাতে চালাতে একবার আড়চোখে ও বাবলির দিকে তাকালো। দেখলো, বাবলি নিজের মনে মসলা চিবোচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর অভী বলল, আচ্ছা, আব্রাকাডাব্রা মানে কি?

বাবলি বলল, ওটা একটা গুপ্তিমন্ত্র। ম্যাজিসিয়ানরা ম্যাজিক দেখাবার আগে বলেন। তাঁদের কাছ থেকে শুনেছি।

—আপনি এসব মন্ত্রে-তন্ত্রে বিশ্বাস করেন? অভী বলল।

বাবলি মুখ না ঘুরিয়েই বলল, দেখলেনই তো করি।

প্রয়োজন পড়লে সব কিছুতেই বিশ্বাস করি। তারপরই বলল, কি নাম বললেন যেন? রসিদ আলি? সাদা দাড়ি। ইস্, কখন যে পৌঁছব না।

একটু পরেই দিনের আলো মুছে যাবে। ঐ উৎরাইয়ের রাস্তায় অভী যত জোরে পারে গাড়ি চালাচ্ছে। অন্ধকার হবার আগে সমতলে নেমে ডিফু নদী পেরিয়ে ডিফু

শহরকে ডানে রেখে জোরে চলে যাবে ডিমাপুরের দিকে। কিন্তু সন্ধ্যে হতে আর দেরি নেই। এখানে আবার গাড়ির কিছু হলে আর উপায় নেই। বৈরী নাগা ছাড়াও জংলী জানোয়ারের ভয় আছে। এখানে নেই এমন জানোয়ার ভারতবর্ষে নেই।

বাবলি ওর হ্যান্ডব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে গাড়ির আয়নাটা ওর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল।

ওকে যত দেখছে ততই অবাক হচ্ছে অভী। বাবলির হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে ও অভীকে বছর দশেক হল চেনে।

বাবলি চুল আঁচড়ানো শেষ করে সবে চিরুনিটা ব্যাগে ঢুকিয়েছে, এমন সময় গাড়িটা আবার সেরকম কোঁ-কোঁ-কোঁ-কোঁ আওয়াজ করে একটু গড়িয়ে গিয়ে থেমে গেল।

অভী কোনো কথা না বলে বাবলির মুখের দিকে চাইল।

বাবলি বলল, ডিমাপুর কত দূর?

—প্রায় কুড়ি মাইল।

ওয়ান্ডারফুল। চলুন, গাড়িটাকে ঠেলে পথের বাঁদিকে সরিয়ে রাখি। আলো থাকতে থাকতে রাত কাটানোর মতো একটা আস্তানা খুঁজতে হয়।

অভী অবাক হয়ে বলল, কেন আব্রাকাডাব্রা?

বাবলি হো হো করে হেসে উঠল।

বলল, একবার লটারী জিতেছি বলে কি বার বার?

হাসির মতো অবস্থা ছিল না তখন অভীর। গাড়িটা ঠেলতে হল না। ব্রেক থেকে পা ওঠাতেই আপনিই গড়িয়ে গেল। বাঁদিকে একেবারে রাস্তা ঘেঁষে গাড়িটা রেখে, বাইরে চারদিকে ভালো করে দেখল। কোথাও জনমানবের চিহ্ন বা বাড়ি-ঘর কিছুই দেখা গেল না। বেশ কিছুক্ষণ আগে একটা গাড়ি ওদের ক্রশ করে কোহিমার দিকে গেছিল। তারপর কোনো গাড়িও চোখে পড়ে নি।

ওরা দুজনে এদিক ওদিক হাঁটল। এদিকে আলো নেভার আর দেরি নেই। সঙ্গে একটা টর্চ পর্যন্ত নেই। বাবলির উপর খুব রাগ হচ্ছিল অভীর এবং বার বার বড় সাহেবের মুখটা ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। বড় সাহেব চিবিয়ে চিবিয়ে বলছেন, "ইরেসপন্সিবল্, বড্ড ইরেসপন্সিবল্ তুমি অভী।"

হঠাৎ বাবলি চেঁচিয়ে উঠল, পাওয়া গেছে। খুব উল্লাসের সঙ্গে বলল, পাওয়া গেছে। ওর উল্লাস শুনে মনে হল, জঙ্গলের মধ্যে বুঝি বা কোনো ফাইভ-স্টার হোটেলই পাওয়া গেল।

এগিয়ে পাহাড়ের দিকে কিছুটা উঠে অভী দেখল একটা কুঁড়ে ঘর। একচালা

ঘর। ঘরের দুদিক বন্ধ, দুদিক খোলা। সামনে কেটে রাখা অনেক কাঠ স্তূপীকৃত করে রাখা আছে। ঘরের মধ্যে একটা বাঁশের তৈরি মাচা। মালিকের শোওয়ার জন্যে বোধহয়।

এক কোণায় একটি মাটির হাঁড়ি। আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। কতকগুলো বাঁশের খোল ঝুলছে বৃষ্টির জল ভরে রাখার জন্যে। মাচাটা এক কোমর উঁচু। একজন লোক স্বচ্ছন্দে শুতে পারে। বাবলির জন্যে একটা বন্দোবস্ত হলেই হল। এদিক ওদিকে চেয়ে অভী নিজের মনেই বলল, মালিক ফিরবেন কি না রাতে, তা কে জানে।

বাবলি বলল, মালিক ফিরবেন না। অন্তত আজ রাতে ফিরবেন না।

—কি করে বুঝলেন?

—বাঃ, কোনান্ ডয়েল পড়েন নি? হাঁড়ির গায়ে রাজ্যের মাকড়সার জাল। বাইরের কাঠগুলোও প্রায় মাসখানেক আগে কাটা হয়েছে। এ তো কমনসেন্স্। বাইরে আগুন জ্বালাবার কোনোরকম চিহ্ন নেই। অতএব বোঝা যাচ্ছে, মালিক এ জায়গাতে কখনো কখনো এলেও রাতে থাকেন না।

অভী বলল, আপনি মাচায় বসুন। আমি গাড়ি থেকে জিনিসগুলো নিয়ে আসি।

অভী গাড়ি থেকে কম্বলটি, বাবলির ব্যাগ এবং ওর ব্রীফ কেসটা নামিয়ে নিল। আরেকবার চেষ্টা করল স্টার্ট নেওয়ার। গাড়ি কোনো কথা বলল না। ঠিক করল, এপথে যদি কোনো ট্রাক বা গাড়ি যায়, তাতে করে ডিমাপুরে ওদের অফিসে খবর পাঠাবে যাতে ভোরে ভোরে ট্যাক্সি নিয়ে তারা আসে। এই রাতে মিস্ত্রি যোগাড় করে, ট্যাক্সি যোগাড় করে এ-পথে এতদূর আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

অভী নিজের থেকে চেঁচিয়ে বলল, কোনো গাড়ির আওয়াজ শুনলেই আপনি ঘরের ভিতরে ঢুকে যাবেন। এভাবে অসহায় অবস্থায় আমরা আছি জানলে রাতে কোনো সময় বিপদ হতে পারে। আপনাকে নিয়েই সবচেয়ে বিপদ।

বাবলি অভীর দিকে চেয়ে চুপ করে থাকল একটু। তারপর বলল, তাই বুঝি?

দেখতে দেখতে ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল। কিন্তু তখনো পুরো অন্ধকার নয়। চারধার থেকে ঝিঁঝি ডাকতে লাগল। কী একটা বড় চতুষ্পদ জানোয়ার উপরের পাহাড়ে আওয়াজ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মিথুও হতে পারে।

বাবলি বলল, দাঁড়িয়ে থাকলে কি আর পথের গাড়ি আপনার কাছে উড়ে আসবে? গাড়ি এলে তো আধ মাইল দূর থেকে আওয়াজই পাবেন।

—আসুন, লেট্‌স্ সেলিব্রেট। কফি খাওয়া যাক।

এই বলে অভীর লাইটারটা চেয়ে খড়কুটো যোগাড় করে একটা পাথরের আড়ালে আগুন জ্বালাবার বন্দোবস্ত করে, ওর ব্যাগ খুলে দুটি এনামেলের গ্লাস ও

নেসকাফের টিন বের করল। বিস্কিটের প্যাকেটটাও বের করল।

তারপর আগুন জ্বেলে বাঁশের খোলে জমে থাকা পরিষ্কার বৃষ্টির জল গ্লাসে ঢেলে জল গরম করে কফি বানালো।

অভীকে দিল এবং নিজেও নিল।

বলল, দারুণ হয়েছে, তাই না?

ওরা যেখানে বসে কফি খাচ্ছিল, সেখান থেকে ডান দিকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল অনেকদূর অবধি।

চারদিকে আবছা অন্ধকার, ঝিঁঝির ডাক, নদীর শব্দ, নানারকম পোকার কটর কটর কুটুর কুটুর শব্দ—এ সমস্ত-কিছু ছাপিয়ে ডিফু নদীর শব্দ।

কেমন ভয় ভয় করছিল অভীর। ইম্ফলে অনেকদিন আছে যদিও, তবুও এরকমভাবে নাগা হিল্সের ভিতরে একজন মেয়ের দায়িত্ব নিয়ে রাত কাটাতে হবে, কখনো ভাবে নি।

বাবলি অস্ফুটে বলল, সত্যি! আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেবো জানি না।

অভী লজ্জিত হল। বলল, ঠাট্টা করছেন? কি করব বলুন, আপনি জোর করলেন, নইলে আমি তো এইরকম গাড়ি নিয়ে ঝুঁকি নিতে চাই নি।

বাবলি বলল, না, না, ঠাট্টা নয়। বিশ্বাস করুন, ছোটবেলা থেকে কত রাত কত জায়গায় কাটিয়েছি, কিন্তু এ রাতের কথা, মানে, এ রাত যদি কাটে, তবে চিরদিন মনে থাকবে।

আমার না, ছোটবেলা থেকেই এরকম জীবন ভারী ভালো লাগে। বিদেশী ছবিতে দেখি, ওদেশের মেয়েরা ইচ্ছে করলে যা খুশি তাই করতে পারে। অথচ আমরা? এই তো আপনার মুখের দিকে চাওয়াই যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, আমি সিন্ধবাদের মতো আপনার পিঠে চড়ে রয়েছি। আমার জন্য আপনার কী ভীষণ চিন্তা। অবলা মহিলা না ভেবে নিছক একজন, অন্য একজন মানুষ বলে আমাদের মেয়েদের কবে যে আপনারা ভাবতে শিখবেন জানি না। আপনাদের এরকম ব্যবহারে মাঝে মাঝে সত্যিই অপমান বোধ হয়।

অভী বলল, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি আমার কেউ নন, সম্পূর্ণ অপরিচিতর মতই। আপনার কিছু একটা হলে আমার দায়িত্ব কতখানি আপনি বুঝতে পারছেন না।

—আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে এই রাতের কথা আপনার মনে হয়তো থাকবে। আপনি সবাইকে বলবেন, ওঃ, কী বিপদেই না পড়েছিলাম এক রাতে। আমি আর আমার এক বন্ধু নাগা হিল্সে।

অভী কথা বলল না। চুপ করে অন্ধকারে বাবলির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

একটু পরে অভী বলল, একটু আগুন করি। আপনার মুখ দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে।

বাবলি অন্ধকারের মধ্যে হাসল। বলল, আমার মুখ কি দেখার মতো?

অভী জবাব দিল না কথার।

খড়কুটো এনে কুঁড়ের বাইরে পথের উল্টোদিকে আগুন করল অভী একটা।

আগুনের আলোয় ঐ পরিবেশে বাঁশের মাচায় বেগুনী আর গোলাপী টেরিকট শাড়ি পরা বাবলিকে দারুণ দেখাচ্ছিল।

অনেক, অনেকক্ষণ পর অভীর বেশ ভালো লাগতে লাগল। অভী বলল, আপনার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে? কি খাবেন? রাতে?

বাবলি একটুক্ষণ ঠোঁট কামড়ালো, বেশি কিছু খাবো না। রসিদ আলিকে বলুন বিরিয়ানি পোলাউ করতে, মাংস যেন একটু আন্ডারডান থাকে। সঙ্গে মুরগীর টিক-কাবাব এবং রাইত।

অভী বলল, ব্যস্-স্। আর কিছুই না!

—নাঃ, আজ আর কিছুই খাবো না।

বলেই বাবলি হাসতে লাগল।

অভীও যোগ দিল সেই হাসিতে। অনেকক্ষণের গুমট টেনসন কেটে গেল অভীর মন থেকে।

এমন সময় কোহিমার দিক থেকে একটা গাড়ি আসার আওয়াজ শোনা গেল।

অভী লাফিয়ে উঠল। বলল, আপনি চুপ করে ওখানে বসুন। পথ থেকে আপনাকে যেন দেখা না যায়। কথা বলবেন না কোনো। কেমন? বলেই অভী তরতরিয়ে নেমে গেল পথের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে আলোর বন্যা বইয়ে একটা জীপকে আসতে দেখা গেল বাঁকের মুখে। অভী হাত দেখালো। জীপটা থামা মাত্র জীপের মধ্যে অন্ধকার থেকে কে যেন বলল, 'হ্যান্ডস্-আপ্'।

অভী হাত তুলল, একজন একটা রিভলবার ওর দিকে ধরল। ওরা নাগাল্যান্ড পুলিশের লোক।

ডিমাপুরে পৌঁছে অভীদের অফিসে একটা ফোন করে দিতে বলল ওদের, যদি পারে। অভীদের কোম্পানির নাম শুনে বলল, খবর দিয়ে দেবে। তবে আজ রাতে কোনো হেল্প্ আসতে পারবে না। ট্যাক্সিও না। আজ রাতে আর্মি কনভয় আসবে ডিমাপুর থেকে কোহিমা। সিভিলিয়ান ট্রাফিক বন্ধ। ওরা বলল, গাড়িতেই থাকবেন। কাল অফিসের লোক এলে গাড়ি নিয়েই একেবারে ডিমাপুর পৌঁছবেন।

ওরা গুড-নাইট করে চলে গেল।

একটু গিয়ে আবার ব্যাক করে এসে বলল, এ জায়গাটাতে হাতির বড় উপদ্রব। সাবধানে থাকবেন।

ওরা চলে গেলে অভী তরতরিয়ে উপরে উঠে এল। কুঁড়েতে পৌঁছে দেখল বাবলি নেই। অভীর বুকের স্পন্দন থেমে গেল। বাবলিকে খুঁজতে কোনদিকে যাবে, ভাবতে ভাবতেই অন্ধকার থেকে বাবলি এসে কুঁড়েতে ঢুকল।

অভী বলল, এমন ভয় পাইয়ে দেন না। বিরক্তির সঙ্গে বলল, কি করতে গেছিলেন একা একা জঙ্গলে, অন্ধকারে? বাঘ আছে, হাতি আছে। কোনো মানে হয়!

বাঁশের খোল থেকে জল ঢেলে মুখ-চোখ-হাত-পা ধুতে ধুতে বাবলি বলল, যা করতে গেছিলাম, তা সবাই একা একাই করে।

অভী লজ্জা পেল। বলল, ওঃ, সরি।

এখন ঠাণ্ডাটা আগের থেকে অনেক বেশি হয়েছে। ডিক্ষু নদী থেকে ধোঁয়া উঠছে। ফ্রিজ খুললে যেমন ঠাণ্ডা ধোঁয়া ওঠে তেমনি।

অভী বলল, বিস্কুট-টিস্কুট খেয়ে আপনি শুয়ে পড়ুন।

—আর আপনি?

—আমি আগুনের পাশে বসে পাহারা দেবো। হাতি আছে, বাঘ আছে, বৈরী নাগারা আছে।

বাবলি বলল, এটা আপনার কাছে রাখুন।

—কি!

হাতের চুড়ি থেকে খুলে বাবলি একটা সেফ্‌টিপিন দিল অভীকে। বলল, হাতি এলে হাতির কান চুলকে দিতে পারেন।

অভী বলল, বাবা, আপনি পারেনও! আপনার কি ভয়ডর বলে কিছু নেই, সত্যি আপনার মতো দস্যি মেয়ে আমি দেখি নি।

বাবলি জবাব না দিয়ে বলল, আগুনটা একটু জোর করুন। ঠাণ্ডায় বসা যাচ্ছে না। কম্বল তো একটা। আপনি কি গায়ে দেবেন?

আমি তো আগুনের পাশেই বসে থাকবো। অভী বলল।

আগুনটা জোর করে দিল অভী। বাইরের গাদা থেকে অনেকগুলো কাঠ বয়ে এনে কুঁড়ের সামনে রাখলো। আগুনে আরেকবার এনামেলের গ্লাসে কফি বানালো বাবলি। তারপর কুটুর কুটুর করে বিস্কুটের প্যাকেটটি শেষ করল দুজনে মিলে।

কফি খাওয়ার পর, অভী ব্রীফ কেসটা মাচার মাথার কাছে রেখে দিয়ে বলল, এই হল বালিশ। এবার শুয়ে পড়ুন। কম্বলটা চারিদিকে ভালো করে গুঁজে নিন।

পোকামাকড় আসতে পারে।

—ঈ-রে—যেন আমার মা এসেছেন। বলল বাবলি।

—নিশ্চয়ই, আপনার মা এখানে থাকলে এসব কি বলতেন না?

বাবলি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, হয়তো বলতেন, জানি না। জানেন, আমি আমার মাকে কখনো দেখিনি। ছবিতে দেখেছি। আমি জন্মাবার সময়ই আমার মা মারা যান। এরকম সব রাতে, যখন খুব ইচ্ছে করে কাছে কেউ থাকুক, কেউ আদরে সোহাগে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরুক, তখন মায়ের কথা খুব মনে পড়ে।

অভী চুপ করে রইল।

অনেকক্ষণ পর বলল, কি হল? শুয়ে পড়ুন।

—হ্যাঁ, শুচ্ছি।

ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগল। ঠাণ্ডাটাও বাড়তে লাগল। কোহিমার দিক থেকে একটা হাওয়া আসতে লাগল হু হু করে। সন্ধ্যের সময় যে চতুষ্পদ জানোয়ারটার আওয়াজ শোনা গেছিল, সেটা তেমনি ঘোরাফেরা করতে লাগল অন্ধকারে। নক্ষত্রখচিত উজ্জ্বল আকাশ নিচের অন্ধকারকে আরো ভারী করে তুলল। আগুনটা জোর করে দিয়ে অভী কুঁড়ের বাঁশের খোঁটায় হেলান দিয়ে বসে রইল।

বাবলি মাচায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগল। মাচাটায় ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ উঠতে লাগল। বলল, ঘুম আসছে না।

তারপর রাতের কোনো এক সময়ে বাবলি ঘুমিয়ে পড়ল।

অভী সামনে দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিল। ওরও মাঝে মাঝে ঢুলুনি আসছিল। মাঝে মাঝে উঠে আগুনে নতুন কাঠ গুঁজে দিয়ে আসছিল।

মাঝরাতে একফালি চাঁদ উঠেছিল আকাশে।

তারপর ঢুলুনির মাঝে মাঝে অভী দেখছিল যে আকাশ মেঘে মেঘে ঢেকে গেল। তারপর কখন যে ও বাঁশে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল মনে নেই ওর।

হঠাৎ অভীর ঘুম ভেঙে গেল ঠাণ্ডা জলের ছিটেয়।

চোখ মেলে দেখল। আকাশে একটিও তারা নেই।

বৃষ্টিতে আগুন নিভে গেছে। ওর গায়েও বৃষ্টির ছিটে লাগছে। ওর ভীষণ শীত করতে লাগল। আধো ঘুমে ওর হঠাৎ বাবলির কথা মনে হল। মুখ ঘুরিয়ে দেখল বাবলি মাচার উপর উঠে বসেছে।

অন্ধকারে বাবলি বলল, আগুনটা নিভে গেল কেন?

—বৃষ্টি পড়ছে বাইরে।

—খুব শীত, না? খুব শীত করছে আপনার?

—হ্যাঁ।

—আপনি এখানে আসুন।

—ওখানে দুজনের জায়গা হবে না।

—হবে, আপনি শীগ্‌গির করে আসুন, নইলে ভালো হবে না। আপনি কি বলুন তো? এত কষ্ট পাচ্ছেন, তবু আমার কাছে আসতে এত লজ্জা, এত সংকোচ!

অভী উঠে এসে কাঁপতে কাঁপতে মাচার পাশে এসে বসল।

বাবলি বলল, আপনি আমার কাছে আসুন।

অভী বসেই রইল।

বাবলি ওর কাছে সরে গিয়ে ওকে দু'হাতে কাছে টেনে নিল। বলল, কম্বলটা দিয়ে আপনি আমাদের দুজনকে ঢেকে রাখুন। আমি আপনাকে জড়িয়ে থাকছি। দেখবেন শীত এখুনি পালাবে। লজ্জা করছেন কেন, আমাকে আপনিও জড়িয়ে থাকুন।

কিছুক্ষণ পর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ওরা দুজনে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। বাইরে বৃষ্টি ভেজা পাহাড়ী হাওয়া হু হু করে গাছপালায় বইতে লাগল। বাবলির শরীরের উষ্ণতায়, ওর বুকের সুগন্ধে, অভী শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। এই অবস্থাতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল ওরা দুজনেই জানে না।

ডিমাপুর থেকে ট্যাক্সি করে দুজন লোক এসেছিল অফিসের। মেকানিকও এসেছিল। গাড়ি ঠিক করে ওখান থেকে বেরোতে বেরোতে সকাল ন'টা হল।

সকালে উঠে বাঁশের খোলের টাট্‌কা জলে মুখ ধুয়ে শাড়ি-টাড়ি ঠিকঠাক করে নিয়ে বাবলি অভীর পাশে এসে বসল।

গাড়িটা স্টার্ট করে অভী বলল, জায়গাটা দেখে রাখুন। জায়গাটার কথা মনে থাকবে? এই রাতের কথা?

গাড়িটা ডিফু নদীর পাশে পাশে আবার গড়িয়ে চলল।

বাবলি খোঁপা থেকে গতকালের বাসি ফুলটা নিয়ে নদীতে ছুঁড়ে দিল।

মাইল দশেক যেতে-না-যেতেই ওরা পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এল। এখন আর দু'ধারে জঙ্গল নেই। সোজা রাস্তাটা চলে গেছে ডিমাপুরের দিকে।

বাবলি বলল, বেশ কাটল সময়টা আমাদের। কালকের রাতটা, আমার ট্রেন তো বিকেলে না?

অভী বলল, হাঁ।

বাবলি বলল, আপনি কি করবেন আমি চলে যাবার পর?

অভী হাসল, বলল, তাই ভাবছিলাম। গত তিরিশ ঘণ্টায় আমি আমার নিজের ইচ্ছেয় কিছুই করি নি। আপনি যা যা বলেছিলেন তাই করেছিলাম। এখন কি করব, তাই ভাবছি।

বাবলি বলল, বেশি ভাববেন না। আপনি বড় বেশি ভাবেন।

অভী বলল, তবু মাঝে মাঝে ভাবতে হয়।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বাবলি বলল, চিঠি লিখলে কি জবাব দেবেন? না, দেবেন না?

—দেব। অভী বলল।

—জবাব দেবেন, কিন্তু জবাবে আবার প্রেম-ট্রেম নিবেদন করে বসবেন না। আপনাকে আমার বড় ভয় করে।

—আপনাকেও আমার খুব ভয় করে। অভী বলল।

—আমার কিন্তু আপনাকে খুব ভালো লেগেছে। বাবলি বলল।

তারপর বলল, আমি চাই, সত্যিই চাই, এ ভালো লাগাটা যেন বজায় থাকে। জানি না হয়তো আপনাকে আমার কিছু বলার ছিল। কিন্তু বলা হল না। এই ঘর ছাড়া, এইরকম বৃষ্টির শীতের রাত ছাড়া সেকথা আর বলা যাবে না, ভাবলে অবাক লাগে। কতগুলো কথা থাকে, হয়তো প্রত্যেকের জীবনেই থাকে ; সেগুলো বিশেষ জায়গা ও বিশেষ মুহূর্তে বলতে না পারলে বলাই হয়ে ওঠে না। সারা জীবন বয়েই বেড়াতে হয়।

তারপর অনেকক্ষণ ওরা চুপ করে থাকল।

অভী বলল, ঐ যে ডিমাপুরের বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে।

বাবলি বলল, সত্যি? আহা রসিদ আলি—বদরপুরী রসিদ আলি। তোমাকে আমি বড় ভালোবাসি। তুমি আমাদের কি খাওয়াবে গো?

তারপরই হঠাৎ বলল, শুনুন ভালো ছেলে, আমাদের যাত্রা শেষ হয়ে এল, আবার দেখা হবে কি না জানি না। আমি যেমন করে কালকের বাসি ফুলটা ছুঁড়ে ফেললাম, আপনিও আমার বাসি স্মৃতিটাকে তেমনি করেই ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, কোনো স্মৃতি-ফিতি নিয়ে বাঁচার কিছু মানে নেই। কেবলমাত্র ভবিষ্যতের জন্যই বাঁচবেন। বুঝলেন?

হুঁ। অভী বলল।

কিছুই বোঝেন নি, চোখ নাচিয়ে বাবলি বলল।

ইম্ফল থেকে কোহিমা হয়ে ডিমাপুরে যখন ওরা সত্যিই এসে পৌঁছলো তখন সকাল দশটা।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাংলোটা নিরিবিলি, তবে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাংলো

যতখানি নিরিবিলি হওয়া উচিত ততটা নয়। ডিমাপুর শহরেরই এক প্রান্তে।

বাবলি গাড়ি থেকে নেমেই বলল, সত্যি! বেশ বাংলোটা। কিন্তু রসিদ আলি কোথায়?

বলতে বলতে বাংলোর পেছন দিকের রান্নাঘর ছোট্ট খাওয়ার ঘর পেরিয়ে সাদা দাড়ি দিয়ে রসিদ আলি এসে হাজির হল।

ওকে দেখেই বাবলি বলল, অভী, আপনি মালপত্র নামানোর বন্দোবস্ত করুন। আমি রসিদ আলির সঙ্গে লাঞ্চে কি কি খাওয়া যায় তার বন্দোবস্ত করছি গিয়ে।

তারপরই একটু থেমে বলল, আপনি মুরগী খান তো? না, পিসীমার বারণ আছে?

অভী হাসল। বলল, আমার কোনো পিসীমা নেই।

বাবলি বলল, মাসীমা তো আছেন?

অভী হাসল। বলল, না, মাসীমাও নেই। কিন্তু আমার মাসীপিসীকে নিয়ে পড়া কেন?

বাবলিকে গতকাল সকালে-পরা শাড়ি-জামাতে রাতে নাগাপাহাড়ের বিপদের মধ্যে রাত কাটানোর পর এবং গাড়ি খারাপ হওয়ার টেনশান ইত্যাদিতে খুবই ক্লান্ত ও শ্রান্ত দেখাবে ভেবেছিল অভী, কিন্তু বাবলির এই ক্লান্তিহীন সপ্রতিভ প্রগলভতাতে এখন সত্যিই ও অবাক হয়ে যাচ্ছে। অভীর অল্পবয়সী জীবনে বাবলি নিশ্চয়ই এক অভিজ্ঞতা। মণিপুরের লক্‌টাক্ লেক প্রথমবার দেখে যেমন মনে হয়েছিল, নাগাপাহাড়ে মিথুং দেখে প্রথমবার যেমন আশ্চর্য হয়েছিল, বাবলিকে কাছ থেকে দেখে ও তেমনিই আশ্চর্য হয়েছিল। বাবলি সম্বন্ধে কোনোরকম বিশেষণ ও ওর সীমিত বাংলা জ্ঞানে খুঁজে পাচ্ছে না। খোঁজবার চেষ্টাও করলো না আর।

বাবলি এক মুহূর্ত অভীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ বলল, আপনাকে দেখার পর থেকেই আমার রবিঠাকুরের একটি চরিত্রের কথা মনে হচ্ছে।

অভী গাড়ির বুট খুলে, মাল নামাতে নামাতে ক্যাজুয়ালী, যেন ওর এসব পাগলের প্রলাপে বিন্দুমাত্র ইন্টারেস্ট নেই ; এমন গলায়, কি? কোন চরিত্র?

বাবলি দুষ্টুমির হাসি হাসল। বলল, রেবতীকে খুব মনে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের 'তিন সঙ্গী'র ল্যাবরেটরী গল্পের রেবতীর কথা! তার পিসীমার আদরের 'রেবু'র কথা।

অভী মনে মনে বিরক্ত হল।

কী ভাবে মেয়েটা? না হয় ইন্ডিয়ান রেভেনিউ সার্ভিসে ঢুকছেই, না হয় পড়াশোনাতে ভালোই, তা বলে অভীকে ও ভেবেছে কী? নেহাত ওর ওপরওয়ালার শালীর মেয়ে বলে, বাবলি নিজেই কি ওর বস্ হয়ে গেছে নাকি? তাছাড়া, বাবলি না জানতে পারে তা, কিন্তু বাবলির মাসী-মেসো জানে, অভীও কোনো দিক দিয়ে

হেয় করার পাত্র নয়। বাবলির চেয়েও সে সব দিক দিয়ে ভালো।

মনে মনে অভী ভাবলো, এতখানি বাড়াবাড়িটা কুশিক্ষা। বাড়িতে বোধহয় কেউ শেখায় নি ছোটবেলায় কতখানি মানায়, কতখানি মানায় না। মা-মরা মেয়ে তো। বখে গেছে অল্পবয়সে। তাছাড়া মেয়েরা ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে নিজেদের কি যেন মনে করছে একেবারে। যেন উড়তে চাইছে সকলেই ডানা মেলে। গতকাল আই-এ-এস কি আই-আর-এস পাস করলেই বুঝি ভাবছে, আমি কি হনু।

অভী গাড়ির বুটটা বন্ধ করতে করতে বলল, আমি যদি রেবতী হই, তবে আপনি কী? আপনি কে? আমার ওপর কিসের অধিকার আপনার?

বাবলি সপ্রতিভতার সঙ্গে বলল, আমি কেউ না, কেউ না। কোনো অধিকার নেই।

কিন্তু কথা শেষ হতে-না-হতে ও যেন হঠাৎ এই এত ঠাট্টা, এত মজা, এত পরিহাসের কুয়াশার মধ্যে ওর ভেতরে কে ছিল, যে-ছিল তাকে দেখতে পেল।

ফরেস্টের কাঠের বাংলোর সুন্দর রং করা অস্তিত্বে, চারধারের শাল-সেগুন গাছের পরিবেশে, বর্ষাদিনের ঝিলমিল করা রোদে, নানান পাখির ডাকে এই ডিমাপুরের আশ্চর্য সকালে কি যেন কি ঘটে গেল।

বাবলির এবং অভীরও মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা আটশো আশি ভোল্টের আলোর মেইন-স্যুইচ নেভানো ছিল। এই সকালে, এই কাঠের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, ঠাট্টা করতে থাকা, হাসতে-থাকা, অন্যকে নিয়ে তামাশা করতে থাকা বাবলির বুকের মধ্যে যেন কি একটা জ্বলে উঠল, চোখের ওপর এমন একটা ছায়া নেমে এলো, যেন তার নিজের মধ্যে সে-ছায়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাবলি নিজেও বুঝি কখনও সচেতন ছিল না।

অভী দেখল, বাবলির মুখটা হঠাৎ এক আশ্চর্য আনন্দে ক্যামেরার ফ্ল্যাশলাইটের মতো এক ঝলক জ্বলে উঠে, দপ্ করে পরক্ষণেই নিভে যায়।

অভী চোখ নামিয়ে নিয়ে গাড়ির পিছনের সীটে এক আকাশ আলোর নিচে দাঁড়িয়েও যেন ফেলে রাখা কম্বলটা দেখতে পাচ্ছিল না। এমন করে খুঁজতে লাগল। বাবলিও বড় বড় গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে দৃশ্যমান রোদঝলমল নির্মেঘ আকাশে চেয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল। যেন আকাশেই তার প্রার্থিত বস্তু আছে ; ছিল।

একটু আগে যেটা ঠাট্টা ছিল, সেটা আর কোনো ক্রমেই ঠাট্টা রইল না। ওরা দুজনেই একই সঙ্গে, অদ্ভুতভাবে আবিষ্ট এক সীনক্রোনাইজেশানের মধ্যে বুঝতে পারল যে দুজনের মধ্যে এমন কিছু একটা হয়ে গেল, এই মুহূর্তে হয়ে গেছে ; যা হবে বলে তাদের দুজনের কারোই জানা ছিল না।

সম্পূর্ণ আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্বাসী বাবলির মুখটা কালো হয়ে গেল। বিদুষী, গর্বিতা, সপ্রতিভ, দুদিন বাদে ইনকামট্যাক্স অফিসার হতে যাওয়া বাবলির সব গর্ব, সব সপ্রতিভতা মাটিতে মিশে গেল। ভালোবাসা, কারো প্রতি কারো সত্যিকারের ভালোবাসা যে কত তীব্র দুঃখময় অনুভূতি এ-কথার আভাস যেন বিদ্যুচ্চমকের মতো বাবলির বুকে বাজলো। জীবনে প্রথমবার।

বাবলি অভীর কথার উত্তর না দিয়ে আর কোনো কথা না বলে, রসিদ আলির পেছন পেছন রান্নাঘরের দিকে গেল।

অভী একে একে মালগুলো নামালো চৌকিদারকে ডেকে। ওপরের ঘরে বাবলির মালগুলো তুলে দিল। নিজেরগুলো, নিচের দিকে বাঁদিকের ঘরে। তারপর গাড়িটাকে বাইরের একটা বড় সেগুনগাছের নিচে পার্ক করিয়ে রেখে ঘরের মধ্যে এসে ইজিচেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরালো। কাল সেই ভোরে দাড়ি কামিয়েছিল। তারপর দাড়িও কামায় নি, জামাকাপড়ও ছাড়ে নি। চেহারার অবস্থা হয়েছে চণ্ডালের মতো।

একা একা ইজিচেয়ারে বসে আঙুলে সিগারেটটা নাড়তে-চাড়তে জানালা দিয়ে বাইরে দূরে উদ্দেশ্যহীনভাবে চেয়ে থেকে অভী নিজের মনকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল। অভীর খুব ভালো লাগতে লাগল, আবার কেমন দুঃখও লাগতে লাগল। এমন আশ্চর্য অনুভূতির শরিক আর হয় নি ও আগে।

এমন সময় পর্দার আড়ালে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে, বাবলি নরম নরম গলায় বলল, আসবো?

—আসুন, আসুন—বলে অভী উঠে দাঁড়ালো।

মনে মনে ও অবাক হল। যে মেয়ে কাল রাতের অন্ধকারে সমস্ত সংস্কারমুক্ততায় নিজেই অভীকে শীতের যন্ত্রণা থেকে বাঁচাতে সেই কাঠুরের ঘরে তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে ছিল সেই-ই আজ সকালের আলোয় তার ঘরে আসতে অনুমতি চাইছে।

বাবলি ঘরে ঢুকে চোখ নামিয়ে বলল, আমার ঘর কোন্‌টা? কোথায় থাকব আমি?

বাবলির মুখটা চোরের মতো দেখাচ্ছিল। বাবলি যেন কি চুরি করে নিয়েছে অভীর। সেই অপরাধে ও চোরের মতো, অপরাধীর মতো মুখ করে চোখ নামিয়ে রইলো। তবে ও-ও কি কিছু চুরি করেছে বাবলির?

অভী চেয়ার ছেড়ে উঠল, বলল, চলুন ওপরে আপনার ঘর। ঐ ঘরটাই সবচেয়ে ভালো ঘর।

তারপর কাছের সিঁড়ি বেয়ে উঠে অভী বাবলিকে ওর ঘরে পৌঁছে দিল।

বলল, বারান্দাটা চমৎকার, তাই না?

তারপর বলল, ভালো করে চান করুন, দেখবেন ভালো লাগছে। আমিও তৈরি হয়ে নিচ্ছি। তারপর একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাবো। কেমন? আপনার হয়ে গেলে নীচে চলে আসবেন।

বাবলি মাথা নোয়াল। তারপর অভী সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করল।

চান-টান করে একটা হলুদ-কালো ডুরে তাঁতের শাড়ি জামা পরে গলায় কালো পুঁতির মালা ঝুলিয়ে যখন বাবলি নিচে নেমে এলো, তখন বাবলিকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময় দুজনের কেউই বিশেষ কথা বলল না। একজন অন্যকে টোস্ট এগিয়ে দিল, অন্যজন-এর প্লেটের কর্নফ্লেক্সে দুধ ঢেলে দিল। কাঁটা-চামচের টুং-টাং শব্দ হচ্ছিল শুধু খাওয়ার ঘরে। একটি মিষ্টি ঝিরঝিরে হাওয়ায় পর্দাটা ওড়াউড়ি করছিল। ওরা কেউই কোনো কথা বলছিল না। গতকাল ও পরশু যে উচ্ছ্বসিত কলকল করা মেয়েটির সঙ্গে অভী কাটিয়ে ছিল, সেই মেয়েটি কোন মন্ত্রগুরুর মন্ত্রবলে যেন বিবশ হয়ে গেল। অভীর চোখে সেই মোটামুটি মোটাসোটা সাধারণ মেয়েটি যেন কী এক অসাধারণত্বের দাবি নিয়ে এসে দাঁড়াল।

ব্রেকফাস্ট খাবার পর বাবলি যত্ন করে কফি বানাল। তারপরে দুজনেই কফি হাতে করে বারান্দার চেয়ারে এসে বসল।

সেগুন গাছগুলোর ছায়া বাংলোর ঘন সবুজ ঘাস-গজানো হাতায় লম্বালম্বিভাবে পড়েছিল। কতগুলো শালিক এসে কিচির-মিচির করে নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করছিল। নিজেদের মধ্যে মান অভিমান ঝগড়া করে নিজেরাই তার নিষ্পত্তি করে আবার উড়ে যাচ্ছিল ; ফিরে বসছিল।

কাঁচা রাস্তা দিয়ে প্যাঁক-প্যাঁক আওয়াজ করে হর্ন বাজিয়ে চেনের ক্যাঁচর-কোঁচর আওয়াজ তুলে সাইকেল রিকশা যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। পথচলতি নাগা ও অসমীয়াদের টুকরো-টাকরা কথাবার্তা ভেসে আসছিল এবং আবার হাওয়ায় ভেসে চলে যাচ্ছিল।

অনেক, অনেকক্ষণ ওরা চুপচাপ বসে রইলো। দুজনে দুদিকে তাকিয়ে। ওরা দুজনে দুজনের নিজস্ব ভাবনায় বুঁদ হয়ে ছিল। যখন মনে মনে অনেক কথা শেষ হয়ে গেছে অথবা মনে মনে অনেক কথা শুরু হবে, সেই মধ্যবর্তী একফালি নামহীন সময়টুকুতে ওরা দুজনেই থমকে দাঁড়িয়েছিল।

অনেকক্ষণ পর অভী বলল, আপনার ট্রেন কটায়?

বাবলি যেন ঘুম ভেঙে বলল, বিকেলে, ঠিক সময় জানি না, একবার খবর নিতে হবে স্টেশন থেকে। তারপর বলল, আপনি আমাকে তুলে দিয়ে আসবেন না?

অভী বলল, আপনার কি মনে হয়?

বাবলি হাসল। বলল, মনে হয় তুলে দিয়ে আসবেন।

তারপরই বলল, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম, এ দুদিন। বলুন?

অভী একটু চুপ করে থেকে বলল, জানি না।

এখনও অভী বুঝতে পারছিল না। যে-অনুভূতির মধ্যে এখন এই মুহূর্তে ও আছে, তাকে কষ্ট বলে কি না জানে না ও। তাকে কি বলে ও সত্যিই জানে না।

তারপরই বলল, আপনারও তো খুব কষ্ট হল, তাই না? আমি কেবল ভাবছি, গত রাত্রে কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটলে, কোনো বিদ্রোহী নাগা বা হাতির উপদ্রবে পড়লে আপনার মাসীমা-মেসোমশাইয়ের কাছে কি করে মুখ দেখাতাম? ভাবতে ভয় লাগছে। ইম্ফলে ফিরে গিয়ে ওদের কি যে বলব, বুঝতে পারছি না।

বাবলি হাসল। বলল, আমার মাসীমা-মেসোমশায় আমাকে চেনেন। আমার দস্যিপনা জানেন। দোষ হলে আমারই হতো। আপনাকে কেউ দোষী করত না।

অভী বলল, অন্য কেউ না করলেও, আমি করতাম।

বাবলি অবাক চোখে তাকাল অভীর দিকে।

তারপর মুখ নীচু করে বলল, কেন? আমি আপনার বসের আত্মীয়া বৈ তো আর কিছুই নই, আমার জন্যে আপনার এত অপরাধবোধ বা দুশ্চিন্তা কেন! পরের জন্যে এত ভাবা ঠিক নয় ; এতখানি কনসার্নড হওয়া ঠিক নয়।

—নয় বুঝি? অভী বলল।

বলে মুখ তুলে বাবলির দিকে তাকাল।

তারপর বলল, কি জানি? হয়তো নয়।

তারপর এলোমেলো হাওয়ায় রসিদ আলির সাদা লম্বা দাড়ি যেমন এলোমেলো হয়ে গেল, তেমন হল বাবলির আঁচল, অভীর চুল। তারপর দেখতে দেখতে কি করে যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, ওরা দুজনের কেউ তা বুঝতে পারল না।

অভীর একবার বেরোবার কথা ছিল ফাইল নিয়ে অফিসের দিকে—কিন্তু অভী বেরোল না। ঠিক করল কাল ব্রেকফাস্ট করে সকাল সকাল বেরিয়ে একেবারে সব কাজ শেষ করে রাতে ফিরবে বাংলোয়। তার পরদিন ভোর চারটায় বেরিয়ে পড়বে ইম্ফলের দিকে কোহিমা হয়ে।

দেখতে দেখতে ট্রেনের সময় হয়ে গেল।

বাবলির মালপত্র নামিয়ে আনা হল নীচে।

অভী বলল, কিছু ফেলে যাচ্ছেন না তো? ঘরটা আর একবার দেখে আসুন। ফেলে গেলে, এখানে কিছু হারিয়ে গেলে, আর কিন্তু পাওয়া যাবে না।

বাবলি একবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গেল। দুপা উঠে নেমে এল।

বলল, না কিছু ফেলে যাই নি, কিছুই হারিয়ে যাবে না এ বাংলোর ঘরে। যদি কিছু হারিয়ে থাকি, তা হারিয়েই গেছে। তা কখনও আর পাওয়া যাবে না।

অভী অন্যমনস্ক ছিল। কথাটা ভালো করে শোনে নি। বলল, সত্যিই কিছু হারিয়ে গেছে নাকি?

বাবলি হাসল। বিকেলের আলোয় হাসিটা কেমন কান্নার মতো দেখাল। বলল, না। যা হারিয়ে গেছে তা ফিরে পাওয়ার নয়।

ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এল। ডিমাপুর স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে ছিল। তখন অন্ধকার হয়ে গেছিল। অভী কম্পার্টমেন্টের ভেতরেই ছিল। বাবলি বলল, এবার আপনি নেমে দাঁড়ান।

অভী নেমে এসে কম্পার্টমেন্টের সামনে প্ল্যাটফর্মের ওপরে বাবলির সামনে দাঁড়াল।

বাবলি খুব সপ্রতিভ দেখাবার চেষ্টায় সচেষ্ট ছিল। দেখাচ্ছিল যে, সে মেয়ে হলেও ইমোশনাল মেয়ে নয়। আফটার অল ও রেভিনিউ সার্ভিসের মেয়ে। ওরা অত নরম হতে পারে না। পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দেওয়া কচি মেয়ের মতো অত আবেগ ওকে মানায় না। তবু এত সচেতন হওয়া সত্ত্বেও বাবলি ইচ্ছা করে অভীর মুখ থেকে মুখ সরিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর লক্ষ্যহীনভাবে চেয়ে রইল।

অভী কিন্তু বাবলির মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। ও কেন জানে না, প্রবলভাবে চেষ্টা করেও ওঁর চোখদুটো বাবলির মুখ থেকে সরাতে পারল না।

এমন সময় সিগন্যাল হলুদ হল। বাঁশী বাজল গার্ডসাহেবের। 'কু' দিয়ে উঠল এঞ্জিন। অভীর বুকের মধ্যেও যেন কি একটা স্বর আর্তনাদের মতো বেজে উঠল।

জানালার শিকের ভেতর দিয়ে বাবলি ওর রিস্টওয়াচ পরা ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। বলল, চললাম।

কি হয়ে গেল অভী জানে না। ও বাবলির হাতটা নিজের হাতে ধরল। একজন নারীর কোমল হাত একজন পুরুষের শক্ত সবল হাতে মুহূর্তের আশ্রয় পেল।

অভী বাবলির হাতে একটু চাপ দিল। তারপর হাতটা ছেড়ে দিয়ে, চোখ তুলে বলল, আবার আসবেন ইম্ফলে বেড়াতে। আপনাকে অনেক কিছু দেখাব। অনেক কিছু দেখার ছিল, জানার ছিল, এত অল্প সময় থাকলেন যে, কিছুই হল না।

ট্রেনটা ছেড়ে দিল। অভী কিছুটা অবধি জানালার পাশে পাশে হেঁটে এল যতক্ষণ না ট্রেনের গতিটা দ্রুত হয়।

বাবলি জানালার শিকের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে বলল, আপনি দিল্লি আসবেন। আপনাকে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাব। আমার ভালো লাগবে। অনেক দেখার আছে। আসবেন?

ট্রেনের গতি ততক্ষণে দ্রুত হয়ে গেছে। বাবলির চোখ থেকে প্ল্যাটফর্মের বাতিগুলো, লোকজনের মুখগুলো দ্রুত মুছে যাচ্ছে। প্লাটফর্ম থেকে মৌচাকে ঢিল-খাওয়া মরীয়া মৌমাছিদের ডানার মতো একটা গুঞ্জরণ উঠছে। উত্তরে অভী কি বলল, শোনা হল না বাবলির, কথাটা শোনা গেল না।

ট্রেনটা আলো ছাড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে পৌঁছে গেল।

এখন আর আলো নেই কোনো, আলো থাকবে না।

বাবলির বন্ধ-করা চোখে একজন সরল সাদাসিধে, আন্তরিকতাভরা ভালোমানুষের অন্ধকারে-মুছে-যাওয়া মুখটি অনেকক্ষণ জেগে রইল।

বাবলি বুঝতে পারল না কতক্ষণ কতদিন এই মুখটা তার চোখে থাকবে। তার যা স্বভাব, তাতে যদি দু'ঘণ্টাও তা থাকে, তাহলেও অবাক হওয়ার কথা নিঃসন্দেহে। ওর মনে কিছু লেগে থাকে না। ওর মনের প্রকৃতিটা আশ্চর্য! ও তা জানে। তা জেনে ও গর্বিত।

কিছুক্ষণ পর বাবলি বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে জল দিয়ে এল।

জানালার পাশে ফিরে এসে বসাতে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া লাগতে লাগল তার চোখেমুখে। বাবলির বেশ প্রকৃতিস্থ মনে হতে লাগল নিজেকে। এতক্ষণে মনে হল, ওর মনকে ও সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে এনেছে। নিজের মনেই শূন্য কুপেতে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হেসে উঠল বাবলি।

বাবলি নিজের মনে বলল, বাবাঃ, সর্বনাশ হতে বসেছিল আমার! রিয়্যালি সিলি ব্যাপার। একটু হলে প্রেমে পড়ে গেছিলাম আর কি!

বাবলির মনে হল, যে ভদ্রলোক বলেছিলেন যে 'আউট অব সাইট, আউট অব মাইন্ড' তিনি কি দারুণ বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান ছেলেদের বুদ্ধিমত্তাকে ও ভালোবাসে, ভালোবাসতে পারে বাবলি। কিন্তু ওরকম বোকা-বোকা ছেলেকে ভালোবাসা বাবলির পক্ষে সম্ভব নয়।

অভী শুধুমাত্র বোকা নয়, ক্যাবলাও, নইলে কোহিমা থেকে ডিমাপুর আসার পথে যখন গাড়ি খারাপ হল, তখন বাবলির রসিকতা বুঝতে না পেরে গাড়ির পেছনে ম্যাজিসিয়ানদের মতো আব্রাকাডাব্রা বলতে বলতে লাথি মারতে পারে কখনও?

কোনো বুদ্ধিমান ছেলে পারে?

বাবলি চটি দুটো থেকে পা আলগা করে সীটের ওপর দু'পা জোড়া করে আরাম করে বসে আবার বলল, বাবাঃ, খুব বেঁচে গেছি এ যাত্রা। পুরো ব্যাপারটা ভাবলেও হাসি পাচ্ছে এখন। অত সোজা নয়।

অন্ধকার থাকতে অভী বেরিয়ে পড়েছিল ডিমাপুর থেকে। তাড়াতাড়ি না বেরোলে ইম্ফলে পৌঁছানো যাবে না। খুজ্‌মাতে নাগাল্যান্ডের বর্ডার দিনে দিনে পেরোতে না পারলে মুশকিল। বিদ্রোহী নাগাদের দৌরাত্ম্য আজকাল কমে গেছে বটে, কিন্তু কিছু বলা যায় না।

দেখতে দেখতে ডিমাপুরের সীমানা ছাড়িয়ে ডিফু শহরকে বাঁদিকে রেখে ও ডিফু নদীর পাশে-পাশে-চলা পাহাড়ী নদীর ধারে এসে পড়ল।

তখন সবে ভোর হচ্ছে। ঝরঝর করে বয়ে চলেছে বর্ষার ঘোলা জলে ভরা ডিফু নদী পাহাড়ের বুক কেটে। এপাশে রাস্তা, ওপাশে ঘন গভীর জঙ্গল। নানারকম বাঁশ ঝোপ, জংলী কলাগাছের ঝাড়, বেত বন, আরো কত কি গাছ-গাছালি। নদীটা এখানে খুব সামান্যই চওড়া হয়ে গেছে সমতলে পড়ে। নদীর দু'পাশে কুমারি গাছ-গাছালি এমন চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করেছে যে ভরদুপুরেও আলো পড়ে না নদীতে। নদীর গায়ে-লাগা সবুজ লতা পাতায় তাই যেন কেমন একটা হলুদ ছোপ লেগেছে। লাল জলের গর্জন, ফিকে হলুদ আর গাঢ় সবুজে ভরা বন, আর তার পাশে চড়াইয়ে-ওঠা ডিমাপুর কোহিমা রোড। দারুণ।

একটু পরেই, প্রায় মিনিট পনরো-কুড়ি গাড়ি চালিয়ে আসার পর অভী সেই জায়গাটায় পৌঁছল। যেখানে ও বাবলির সঙ্গে রাত কাটিয়েছিল।

অভীর তাড়া ছিল। পথে দাঁড়াবার কথা ছিল না। তবু কি যেন হল ওর, ও গাড়িটাকে বাঁ ধার ঘেঁসে দাঁড় করালো। তারপর পাকদণ্ডী বেয়ে উঠে সেই নাগা কাঠুরের কাঠের ঘরে গিয়ে পৌঁছল। ঘরটার মধ্যে কিছুক্ষণ একা দাঁড়িয়ে থাকল অভী।

ওরা যেখানে কাঠ এনে আগুন করেছিল, যেখানে বসে কফি বানিয়েছিল বাবলি, সেই পোড়া কাঠগুলো ঠিক তেমনি আছে। বাঁশের চোঙটা আবার বৃষ্টির জলে ভরে গেছে। ওখানে চতুর্দিকের মাথা-উঁচু নাগা পাহাড় আর দূরের নদীর ঝরঝরানি শব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যেন অভী বাবলির অস্তিত্ব অনুভব করল। ওর মনে হল, এখুনি বুঝি সেই বেগুনে-রঙা জংলা-কাজের টেরিকট শাড়ি পরা বাবলি ওর সঙ্গে নতুন কোনো রসিকতা করে ওকে অপ্রতিভ করে দেবে। বাঁশের মাচাটাকে আজ সকালে

অবিশ্বাস্যরকম ছোট্ট দেখাল। এর ওপর শেষ রাতে বাবলি যখন ওকে ডেকে নিয়েছিল, তখন কি করে যে ওরা দুজনে এ মাচায় এঁটেছিল তা ভেবেও ওর আশ্চর্য লাগতে লাগল। লোকে কী একটা কথা বলে না? ভাব থাকলে তেঁতুলপাতেও দুজনের ঠাঁই হয়। অভী ভাবল, কথাটা বোকা বোকা। নাকি অভীই বোকা হয়ে গেছে?

আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট শেষ করে অভী আবার গাড়িতে গিয়ে বসল। তারপর গাড়ি স্টার্ট করে এগিয়ে চলল। কোহিমার দিকে।

সামনে অনেক পথ বাকি। নাগাল্যান্ডের মধ্যে কোহিমা, জাখ্‌মা, খুজ্‌মা হয়ে মাও। তারপর কানকোপ্‌কি হয়ে অনেক-অনেক দূরে মণিপুরের মধ্যে ইম্ফল।

অভী এর আগে প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি ফালতু জোলো কথা অনেক নাটক-নভেলে পড়েছে। পড়তে পড়তে হাসি পেয়েছে। যারা এসব পানসে প্রেমের গল্প লেখে এবং যারা তা পড়ে, তাদের নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে তার মনে কখনও কোনো সংশয় ছিল না। এই বিংশ শতাব্দীতে প্রেম নামক কোনো বস্তু আছে বলে ও সত্যি সত্যি কখনও বিশ্বাস করে নি। কিন্তু গতকাল থেকে ও যেন কেমন ঘোরের মধ্যে আছে। ওর কি করোনারি অ্যাটাক্ হবে? নইলে এমন ঘুম-ঘুম ঘোর-ঘোর লাগছে কেন সব সময়? পথের সব জংলী ফুল, সব পাখিকে, সকালের রোদ্দুরকে ওর হঠাৎ এত ভালো লেগে যাচ্ছে কেন? এতদিন চোখ-খোলা থাকলেও যা কখনও চোখে পড়ে নি, সেইসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ সামান্য-সামান্য জিনিস আজ সকালে হঠাৎ এমন অসামান্যতায় আবিষ্কৃত হচ্ছে কেন? দারুণ একটা ভালোলাগা এবং ভালো না-লাগাতেও কেন ও এমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে বার বার?

অভী জানে না কেন? অভীর তিরিশ বছরের জীবনে এরকম বোধ, এরকম অনুভূতি ওর এই-ই প্রথম। বুদ্ধিমান অভী, ব্রিলিয়ান্ট অভী জীবনে এই-ই প্রথম বোকা হয়ে গেছে।

বাবলি ডিমাপুর থেকে ট্রেনে চড়ে ভোরের দিকে এক সাহেবী চা-বাগানে নেমে পড়েছিল। সে বাগানের ম্যানেজার ওর আত্মীয়। সেখান থেকে চা-বাগানের ছোট্ট প্লেনে দমদম এসেছে আজই দুপুরে। এয়ারপোর্ট থেকে আর যায় নি শহরে, কারণ, সন্ধ্যের ফ্লাইটে দিল্লির টিকিট পেয়েছিল ও একটা। ভালোই হল। জয়েনিং ডেটের দুদিন আগেই পৌঁছে যাবে ও।

দমদম এয়ারপোর্টের ডোমেস্টিক লাউঞ্জে বসেছিল বাবলি। হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়েছিল। তারপর সোফায় গা এলিয়ে বসে

একটা পত্রিকা দেখছিল। এখনও প্রায় তিন ঘণ্টা সময় কাটাতে হবে এখানে। তারপর ফ্লাইট অ্যানাউন্সড হলে চেকিংয়ে যেতে হবে। এই এক ঝামেলা হয়েছে আজকাল। হাই-জ্যাকিংয়ের জন্য প্রতিটি এয়ারপোর্টেই এই বিপত্তি।

কিছুক্ষণ পর ও উঠে গিয়ে টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করল অরু মাসীকে।

বাবা কলকাতায় ছিলেন না, ট্যুরে গিয়েছিলেন। ও জানত বাড়ির চাকরকে ফোন করে বাবার খবর নিল বাবলি।

তারপর ফোন করলো দু'-একজন বন্ধুবান্ধবকে। ফোন শেষ করে ও যেখানে বসেছিল সেখানে ফিরে আসছে, এমন সময় হঠাৎ ঝুমার সঙ্গে দেখা। লালরঙা মেকআপ বক্স হাতে নিয়ে হনহনিয়ে কোথায় চলেছে যেন।

বাবলি নিচু গলায় ডাকল, এই ঝুমা।

ঝুমা ফিরে দাঁড়াল। কানের ঝুমকো দুলে উঠল। ঝুমা ওকে দেখতে পেয়েই অবাক আনন্দে চোখ বড় বড় করে বলল, ওমা বাবলি, তুই! তারপরই বলল, তুই এখানেই থাক। আমি এখুনি আসছি।

ঝুমা এখন এয়ার-হোস্টেস। দিল্লির বিখ্যাত মেয়ে-কলেজ মিরান্ডা হাউসে ওরা একসঙ্গে পড়ত।

ঝুমার বাবা দিল্লির নামকরা ব্যবসাদার। ঝুমার আর কোনো ভাইবোন নেই। ও বাবার একমাত্র মেয়ে। ঝুমার বাবা বলেছিলেন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়তে। কিন্তু ঝুমা কেন যে এয়ার-হোস্টেস হতে গেল, তা ও-ই জানে। ঝুমার চেহারাটা হিংসা করার মতো। যেমন লম্বা, তেমন মুখশ্রী, তেমনি ফিগার। দিল্লির কত বাঙালি ও অবাঙালি ছেলে যে ঝুমার জন্যে পাগল, তা বাবলি জানে। ও শুধু দেখতেই যে ভালো, তা নয়। পড়াশোনাতে এবং স্পোর্টসেও ভালো ছিল। ঝুমা বলতে গেলে বাবলিদের আইডল ছিল। ও সহজে কমপিটিটিভ পরীক্ষায় বসতে পারত এবং বসলে বলা যায় না, ফরেন সার্ভিসেও হয়তো সিলেকটেড হত। কিন্তু তা না করে, ও জেদ করে এয়ার-হোস্টেস হল পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে। পাগলী মেয়ে একটা।

দেখতে দেখতে ঝুমা ফিরে এল। ফিরে এসে ওর পাশে বসল। বসেই বলল, অ্যাই বাবলি, তুই কি মুটিয়েছিস রে?

বাবলি হাসল। বলল, আমি কবেই বা সুন্দরী ছিলাম। তোর মতো ফিগার থাকলে তো হয়েই যেত। কি কি হত তাই-ই ভাবি।

ঝুমা বলল, না রে, ওরকম করে বলিস না। আমি এখন দারুণ মনঃকষ্টে আছি।

বাবলি হাসতে হাসতে বলল, কি রকম?

ঝুমা বলল, অবস্থা খুব খারাপ। একজনের জন্য পাগল হয়ে রয়েছি। তারপর

বলল, চল, চা খাই। চা খেতে খেতে বলব।

বাবলি বলল, একটু আগে তো লাঞ্চ করলাম।

ঝুমা হাত ধরে টানল। বলল, চল না। ভাত হজম হয়ে যাবে।

বাবলি বুঝল, ঝুমার হাত এড়ানো সহজ নয়। বলল, চল। ওরা দু'জন রেস্টুরেন্টে এসে ঢুকতেই বারের দিক থেকে দু'জন ইয়াং হ্যান্ডসাম পাইলট হাত তুলে ঝুমাকে উইশ করল। ঝুমা বাঁ হাত ওপরে তুলে একসঙ্গে বারকয়েক নাড়িয়ে দুজনের অভিবাদনই একসঙ্গে গ্রহণ করল।

বাবলি বসতে বসতে বলল, বাবাঃ, তোর কত অ্যাডমায়ারার রে?

ঝুমা তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, দূর দূর, এদের বেশির ভাগকেই আমার জানা। যে যার নিজের তালে ঘুরছে। কোনোরকমে নাইট হল্টে বাইরে আমায় মওকামত পেয়ে শুয়ে পড়ার তাল। বুঝলি না। পুরুষ জাতটা শুয়োরের মতো। কোনো রস-কষ নেই জাতটার। ওরা খালি ঐ একটা জিনিস বোঝে।

বাবলির কান লাল হয়ে গেল। বলল, এই আস্তে বল, কি হচ্ছে? শুনতে পেলে?

ঝুমা বলল, আহা, বুড়ো খোকারা যেন কিছু জানে না? আমি যেন মিথ্যে কথা বলছি। একসঙ্গে কাজ করতে হয়, তাই হাত নাড়লাম, তাই ভালো ব্যবহার করি। এ ছাড়া কি?

বাবলি কথা ঘোরাল। বলল, তারপর তোর মনঃকষ্টের কারণটা বল?

ঝুমার মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, দাঁড়া দাঁড়া, বলছি। চায়ের অর্ডারটা দিয়ে নিই আগে। বলেই বেয়ারাকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিল। তারপর নিজের মনেই বলল, আমার আজকে ম্যাড্রাস ফ্লাইট। সে এক ঝকমারি। সমুদ্রের ওপরের ফ্লাইট হলে লাইফ বেল্ট আর অক্সিজেন মাস্কের ব্যবহার দেখাতে হবে প্যাসেঞ্জারদের। ডেমনস্টেশানে তো তাঁদের ভারী ইন্টারেস্ট—সব ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকবে বুকের দিকে, পেটের দিকে, যখন দু'হাত ওপরে তুলে ডেমনস্ট্রেট করব।

বাবলি খিলখিল করে হাসল। বলল, তুই ভীষণ খারাপ হয়ে গেছিস। বাবা, কেউ যদি তোর অমন ফিগার একটু চোখের দেখা দেখে আনন্দ পায়, তাতে তোর কি? তোকে তো আর খেয়ে ফেলছে না।

ঝুমা বলল, খেয়ে ফেলা এর চেয়ে ভালো ছিল। তুই জানিস না, কেমন সুড়সুড়ি লাগে। অন্য কেউ আমার দিকে অসভ্যের মতো তাকালেই আমার সুড়সুড়ি লাগে। পেছন দিকে তাকালেও আমি বুঝতে পারি।

বাবলি আবার হাসল। বলল, পারিসও বাবা তুই।

পরক্ষণেই ঝুমা খুব গম্ভীর হয়ে গেল।

বলল, আমার ম্যাড্রাস, দিল্লি, বোম্বের ফ্লাইট ভালো লাগে না। আমি ইম্ফলের ফ্লাইট চাই।

বাবলি অবাক হয়ে তাকাল ঝুমার দিকে। বলল, হঠাৎ ইম্ফলের ওপর এত প্রীতি? জানিস, আমি ইম্ফল থেকে আসছি?

ঝুমা লাফিয়ে উঠল। বলল, ওমা, সত্যি! ঈশ, তোর কি মজা রে! তুই কি ওখানের কাউকে চিনিস? আমার সঙ্গে ইম্ফলের একজন লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে হবে। পারবি? তোর কে থাকেন সেখানে বল না?

বাবলি অবাক চোখে হাসল। বলল, আমার মেসোমশায় থাকেন ওখানে। কিন্তু যার সঙ্গে আলাপ করবি, সে কে? মণিপুরী কোনো ভদ্রলোক না কি?

ঝুমা হড়বড় করে বলল, না রে না, বাঙালি। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে কিন্তু আলাপ হয় নি। মানে আলাপও হয়েছে, কিন্তু সে নিছকই হ্যাংলার আলাপ। কিন্তু কি বলব তোকে, আমি দেখেই, শুধু কথা শুনেই খুব বিপদে পড়ে গেছি। আলাপ হলে জানি না কি করব? হয়তো ভালো লাগায় মরেই যাব।

এই অবধি বলেই ঝুমা থামল। পরক্ষণেই ঝুমা বলল, ছবি দেখবি? হিংসা করিস না যেন। বলেই ওর হ্যান্ডব্যাগটা থেকে খামে মোড়া একটা ছবি বের করল।

বাবলি বলল, তোর সঙ্গে আলাপই হল না, আর তুই ছবি কোথায় পেলি?

ঝুমা চোখ নামিয়ে বলল, কলকাতায় এসেছিল সে, আমার পিসতুতো দাদা-বৌদির সঙ্গে রোজ্জ সাঁতার কাটতে আসত সুইমিং ক্লাবে। ওখানেই সাঁতার কাটতে গিয়ে দেখা। আমার সঙ্গে জাস্ট ফর্মাল ইনট্রোডাকশান হয়েছে। মাত্র দুদিন ছিল এখানে। কি কাজে যেন এসেছিল। আমার দাদা তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ—বলে, বহুদিন এত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে চোখে পড়ে নি। তাছাড়া ভালো ক্রিকেট খেলে, ভালো ইংরেজি গান গায় ; ভালো নাচে। আরও জানিস? কবিতা লেখে।

বাবলি বিরক্তির গলায় বলল, যত ট্র্যাশ। এ যেন রূপকথার রাজপুত্র—কোনও দোষই নেই। এমন হতে পারে না। সবকিছুই এমন বাড়াবাড়ি ভালো বিশ্বাস হয় না। তারপর একটু থেমে বলল, আর দেখতে কেমন? তোর যা নাক-উঁচু, তোর পছন্দ হওয়া তো সোজা কথা নয়। রমেশ মালহোত্রার মতো হ্যান্ডসাম ছেলেকে তুই আত্মহত্যা করিয়ে মারলি; তোর কপালে দুঃখ আছে।

ঝুমা চায়ের কাপে চিনি নাড়তে নাড়তে বলল, দুঃখ নেই, দুঃখ নেই। আমার কপালে এখন দারুণ সুখ। তুই দেখিস। একবার ইম্ফল যাই-ই-না। অপারেশনাল ম্যানেজারকে ধরে-পড়ে ফ্লাইটটা একবার ম্যানেজ করতে পারলেই ব্যস্-স্। তা না

হলে ছুটি নিয়ে নেব। দরকার হলে চাকরিই ছেড়ে দেব। ইস্ফলে যাবার জন্যে আমি সব করতে পারি। স—ব-সব।

তারপরই একটু থেমে বলল, ঝুমা রায় কোনো পুরুষকে চাইলে, সত্যি সত্যিই পেতে চাইলে—সে পুরুষের সাধ্য কি যে তাকে প্রত্যাখ্যান করে?

ঝুমার রূপকথার সেই নায়কের ছবি দেখার কোনো ঔৎসুক্য ছিল না বাবলির। কিন্তু পাছে বন্ধু মনে দুঃখ পায়, তাই আস্তে আস্তে খাম থেকে ছবিটা বের করল বাবলি।

ছবিটা খাম থেকে সম্পূর্ণ বাইরে আসতেই বাবলির হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল। বাবলি দেখল, অভী। কালো-রঙা সুইমিং ট্যাঙ্ক পরে সুইমিং পুলের পাশে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবলির হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল দুটি কারণে।

প্রথমত ছবিটি অভীর বলে। দ্বিতীয়ত সুইমিং ট্যাঙ্ক-পরা অভীর পুরুষালী শরীরের চমৎকার গড়ন দেখে। বাবলি অভীর গুণ সম্বন্ধে এত কথা জানত না। আরও জানত না, কখনও জানে নি যে ঢোলা প্যান্ট পরা সাদা-সিধে ক্যাবলা মানুষটার ঝুলঝুলে পোশাকের আড়ালে এরকম একটা শরীর থাকতে পারে। এমন সুগঠিত পা, বুক, এমন কোমর। কোনো পুরুষ মানুষের শারীরিক সৌন্দর্য যে এমন করে ওর মনকে নাড়া দিতে পারে বাবলি তা আগে জানত না। ভাবত, সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যের পুজো পাওয়া বুঝি মেয়েদেরই একচেটে।

বাবলি অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। ও কথা বলছিল না।

ঝুমা ওর দিকে তাকিয়ে খুব খুশী খুশী গলায় বলল, কি রে? কি হল?

বাবলি খুব সপ্রতিভতার ভাঁন করে বলল, ভাবছি।

কি ভাবছিস? ঝুমা উদ্‌গ্রীব হয়ে বলল।

বাবলি বলল, এই একটা সাধারণ চেহারার ছবির মধ্যে তোর মতো মেয়ে কি দেখলো এমন ভালোলাগার মতো? পুরুষদের মধ্যে অনেকে যেমন আছে, যারা মেয়েদের শরীর ছাড়া কিছুই বোঝে না, তেমন মেয়েদের মধ্যেও কিছু কিছু তেমনি আছে বইকি! তবে তুই যে কারো সুইমিং ট্যাঙ্ক পরা ছবি বুকে করে বেড়াবি, তা আমি ভাবতেও পারি নি।

ঝুমা এ কথায় দুঃখিত হল।

তারপর বলল, বিশ্বাস কর, এছাড়া আর কোনো ছবি পাওয়ার উপায় ছিল না আমার। তাছাড়া, বিশ্বাস কর, শরীর ব্যাপারটা জাস্ট ইনসিডেন্টাল। কোনো লেখাপড়া জানা মানুষ কি শুধুই অন্য একটা শরীর দেখে ভালোবাসতে পারে

কাউকে? হ্যাঁ, হয়তো তার সঙ্গে শুতে চাইতে পারে, সেটা নেহাতই শরীরের কামনা। একাধিকবার শুতেও পারে হয়তো ; কিন্তু শোওয়া আর ভালোবাসা কি এক? তুই-ই বল।

বাবলি বলল, জানি না। তোর মতো আমি অত জানি না। তবে যাই-ই বলিস আমি তো মানুষটা কেমন জানি না। তবে ছবিতে শুধু চেহারাটাই দেখা যায়, আর তো কিছুই বোঝা যায় না। চেহারাও তোর যোগ্য নয়। রমেশ মালহোত্রা তোর জন্য স্লিপিং পিল খেলো, আর তুই এই লোকের জন্য পাগল! ভাবা যায় না। তোকে বুঝতে পারি না।

ঝুমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

বলল, তোকে হয়তো না বললেই ভালো করতাম। হয়তো ছবিটাও তোকে দেখানো উচিত হয় নি আমার। মিরান্ডা হাউসের দিনগুলোর পর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে—অনেক বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে তোর ও আমার জীবনে—আমরা বান্ধবী থাকলেও সেই ফাস্ট ইয়ারের প্রিয় সখী যে আমরা নই আর, তা আমি বুঝতে পারি নি।

এই অবধি বলে ঝুমা বলল, দ্যাখ বাবলি, তুই কখনও আমাকে পুরোপুরি বুঝেছিলি বলে আমার মনে হয় না। তোর বরাবরই হয়তো ধারণা ছিল যে, যেহেতু আমি হাসিখুশি চঞ্চল, সুতরাং গভীরতা বলতে আমার মধ্যে কিছুই নেই। তোর এই ভাবনাটা ভুল কি ঠিক তা জানি না। তবে এটা ঠিক যে তুই মিরান্ডা হাউসে যে ঝুমাকে জানতিস, এই ঝুমা সে নয়। সে অনেক বদলে গেছে। তুইও হয়তো অনেক বদলে গেছিস। আজ হয়তো চেষ্টা করেও আমরা একে অন্যকে বুঝতে পারব না।

একটু চুপ করে থেকে ঝুমা আবার বলল, যাক অন্য কথা বল। কি কথা থেকে কি কথায় এসে যাচ্ছিস তুই। এতদিন পরে দেখা হল আর—! তুই কি দিল্লিতেই জয়েন করছিস নাকি?

বাবলি অবাক হয়ে বলল, তোকে কে বলল? তোর বয়ফ্রেন্ড কি তোকে ইম্ফল থেকে জানিয়েছে নাকি আমার সম্বন্ধে?

ঝুমা বিরক্ত হল। বলল, তুই কিরকম গ্রাম্য হয়ে গেছিস? তুই এত জেলাস কেন আমার বয়ফ্রেন্ড সম্বন্ধে? তাও বুঝতাম, তুই যদি বা চিনতিস তাকে। এবং সে যদি সত্যিই আমার বয়ফ্রেন্ড হত।

বাবলি কথা বলল না।

ঝুমা বলল, গত সপ্তাহে ইন্দিরা চাওলা দিল্লি থেকে চিঠি লিখেছিল, তার চিঠিতে সব খবর জানলাম।

বাবলি বলল, চল ওঠা যাক। বলে চায়ের দাম দিতে গেল।

ঝুমা বলল, আমিই দিই। আমিই তো তোকে ডাকলাম।

বাবলি বলল, দে।

বাবলি যেখানে বসেছিল সেখানে এসে বসল। ঝুমা বলল, আমার এখন রিপোর্ট করতে হবে। চলি রে বাবলি। আবার দেখা হবে।

ঝুমা চলে যেতে না যেতেই বাবলির শরীরটা খুব খারাপ লাগতে লাগল। অভীর ছবিটা চোখের উপর বার বার ভাসছিল। আর বাবলি ভেতরে ভেতরে শরীরে কি মনে জানে না, কোথায় কি এক দারুণ অস্বস্তি বোধ করছিল। বাবলির তখন খুব ইচ্ছা করছিল যে, ঝুমার কাছ থেকে ছবিটা কেড়ে নেয়। খুব ইচ্ছা করছিল।

ও বসে বসে ভাবছিল, লাউঞ্জের আলোর মধ্যে, ক্ষণে ক্ষণে মাইক্রোফোনের অ্যানাউন্সমেন্টের মধ্যে নানান লোকের নানান কথার মধ্যে বসে বসে বাবলি ভাবছিল, ইচ্ছে তো কত কিছুই করে। জীবনে কটা ইচ্ছেই বা সফল করা যায়? সফল হয়?

সন্ধ্যে হতে দেরি ছিল। এইমাত্র অভী খুজ্‌মার চেকপোস্ট পেরিয়ে এসেছে। কোহিমাতে সামান্য কাজ ছিল। সেই কাজ সারতে এবং খেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল একটু।

মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের লাল আভা দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকের পাহাড় ঝরনা-ঘেরা ঘন সবুজ বর্ষণস্নিগ্ধ উপত্যকায় রোদের সোনার আঙুল এসে ছুঁয়েছে।

শীত-শীত লাগছে। অভী বাঁদিকের কাঁচটা তুলে দিল। কোটের বোতামটা আটকে নিল। তারপর স্টিয়ারিং ধরে বসে এই বিষণ্ণ অথচ আশ্চর্য সুন্দর অপরাহ্নের মতো এক বিষণ্ণ ও শান্ত ভাবনা বুকের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে ও গাড়ি চালাতে লাগল।

বোয়িং প্লেনটা টারম্যাকের ওপরে দাঁড়িয়েছিল।

দিল্লির ফ্লাইট।

দমদমের আকাশে বেলা পড়ে এসেছিল।

বাবলি স্টারবোর্ড সাইডে একেবারে সামনে জানলার পাশের এক সীটে বসেছিল। বেলা-শেষের ম্লান আলো এয়ারপোর্টের সীমানার পাশের নারকেল গাছের মাথায় কলাগাছের পাতায় লাল টালির ঘরে আলতো করে লেগেছিল। জেট এঞ্জিনগুলো স্টার্ট করাই ছিল। মাটিতে দাঁড়ানো স্ক্রু। বুড়ো আঙুল তুলে দেখাল। প্লেনটা চলতে শুরু করলো। আস্তে আস্তে ট্যাক্সিইং করে মেইন স্ট্রিপের দিকে

এগোতে লাগল প্লেনটা। তারপর যশোর রোডের দিকে চলে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল।

ভেতরে লাল আলোটা জ্বলছিল সীটবেল্ট্ বাঁধার সংকেত জানিয়ে, রবিশঙ্করের সেতার বাজছিল। এয়ার-হোস্টেস তাড়াতাড়িতে লজেন্স টফি মৌরি এবং তুলো নিয়ে সবশেষে বাবলির কাছে এলো। এখন এঞ্জিন দুটো ফুল থ্রটল-এ দিয়ে দিয়েছিল ক্যাপ্টেন। এখন টেক-অফ-এর জন্যে এগোবে প্লেন।

হঠাৎ এয়ার-হোস্টেসের মুখে চোখ পড়ায় বাবলির ভুরু কুঁচকে উঠল। পৃথিবীর কোনো এয়ার-হোস্টেসকেই বাবলির এখন অনেকদিন যে সহ্য হবে না, একথাটা বাবলি বোধহয় বুঝতে পারে নি। বুঝতে পেরে অস্বস্তি লাগল।

প্লেনটা দেখতে দেখতে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল। ল্যান্ডিং হুইল দুটো আস্তে আস্তে এসে প্লেনের তলপেটে ঢুকে গেল। প্লেনটা একটু উঠে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল পশ্চিমে। তারপর সোজা মেঘ ফুঁড়ে উঠতে লাগল।

ইম্ফলের স্মৃতি, নাগাল্যান্ড মণিপুর ডিমাপুরের সব স্মৃতি নীচের সন্ধ্যের বাতিজ্বলা কলকাতা শহরের লক্ষ লক্ষ কম্পমান উজ্জ্বল বিন্দু এক শরীরে লীন হয়ে, এক আশ্চর্য, আনন্দময় দেয়ালী হয়ে নীচে ছড়িয়ে রইল।

বাবলি সীট-বেলট্টা খুলতে খুলতে নীচে তাকিয়ে নিজেকে বলল, ও এখনও যথেষ্ট বড় হয় নি। এখনও বেশ ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। নিজেকে একটু শাসন করতে হবে।

চার

দিল্লি এয়ারপোর্টের ওপরে যখন প্লেনটা এল তখন আটটা বাজতে দশ।

দেখতে দেখতে প্লেনটা নামতে লাগল। ল্যান্ডিং লাইট দুটো আলোর বন্যা বইয়ে জ্বলে উঠল অন্ধকারে। নিচের টারম্যাকের দু'পাশে সারবন্দী রঙীন বাতিগুলো ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। তারপর সামনের চাকা দুটো মাটি পেল—লাফিয়ে উঠল প্লেনটা। পিছনের চাকাও মাটিতে নামল।

এমন হয় না কখনও বড় একটা। ও পাইলট বোধহয় ঝুমার মতো কোনো এয়ার-হোস্টেসের কথা ভাবছিল।

ব্যাড ল্যান্ডিং—অ্যাবসলুটলি ব্যাড ল্যান্ডিং।

এমন চমৎকার আবহাওয়ায় এরকম ল্যান্ডিং হওয়ার কথা নয়। প্লেনটা যখন থেমে দাঁড়ালো ডোমেস্টিক লাউঞ্জের সামনে—সিঁড়ি এসে লাগল—যখন প্লেনের দরজা খোলা হল তখনই বাবলি বুঝল বাইরে বৃষ্টি না হলেও ঝড়ের মতো হাওয়া বইছে। গরম হাওয়া। এখুনি ঝড় বৃষ্টি হবে।

দিল্লি এয়ারপোর্টের লবী-করিডর—এসব দেখলে নতুন লোকের তাক লেগে যাবার কথা। ফায়ারব্রিকস-এর দেওয়াল চতুর্দিক ঝকঝক তকতক করছে। এখানে এসে নামলেই মন ভালো লাগে। তাছাড়া, বাবলি দিল্লির মেয়ে বলেও।

কাকা-কাকিমা নিতে এসেছিলেন বাবলিকে।

ওর স্যুটকেসটা এখনও পেতে দেরি। এখানে অবশ্য কনভেয়র বেল্টে করে ঘুরে ঘুরে যায় মালপত্রগুলো। দমদমের মতো নয়—তাই এত বেশি সময় লাগে না।

তবু কাকা কাকীমার সঙ্গে কফি খেতে গেল বাবলি।

কাকা রসিক লোক—বাবার মতো। কাকীমা রাশভারী গম্ভীর। বাবলি জানে কাকীমা বাবলিকে পছন্দ করেন না। কিন্তু কি করা যাবে? এ পৃথিবীতে সকলের কি পছন্দ হয় সকলকে।

কাকা বললেন—আমার এক বন্ধু আছেন এখানে ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনার। তুই তার কাছে এ দুদিন গিয়ে তালিম-টালিম নিয়ে নে।

বাবলি হাসল। বলল, আহা। আমরা এতদিন মুসৌরীতে নাগপুরে কি করলাম তাহলে?

কাকা হাসলেন। বললেন—কি করলি তা তো আমি জানি। আর যাই-ই করিস কাজ শিখিস নি মোটেই।

বাবলি কপট রাগের সঙ্গে বলল—তোমার অ্যাসেসমেন্ট করলেই বুঝবে কাজ শিখেছি কি না। তখন ছেড়ে দে ছেড়ে দে বলে তুমি কাঁদতে বসবে।

কাকা হাসলেন। বললেন—এটাই তো তোদের ভুল ধারণা। ভালো কাজ শেখা মানেই বুঝি লোকের ওপর অত্যাচার করা? যে ভালো কাজ জানে, সে সবসময় ফেয়ার অ্যাসেসমেন্ট করে। তার অ্যাসেসমেন্ট কখনও আপীলে যায় না এবং আপীলে গেলেও তা সবসময় কনফার্মড হয়। এমনভাবে কাজ করবি যেন কাজে সুনাম হয়। দাদার মুখ রাখিস। বুঝলি বাবি।

কাকীমা বিরক্তির গলায় বললেন—কাজের কথা তো পরেও বলা যাবে। এয়ারপোর্টেই যদি সব কাজের কথা বলে শেষ করবে তাহলে আমাকে আনা কেন?

কাকা লজ্জা পেয়ে বললেন, সরী! সরী! বল বাবলি। ইম্ফল কেমন দেখলি?

বাবলি বলল—দারুণ। আর শুধুই কি ইম্ফল? নাগাল্যান্ড গিয়েছিলাম—জান?

কাকা অবাক হলেন। বললেন—কই? যাওয়ার কথা ছিল না কি?

—না। কথা ছিল না। ওয়েদারের জন্য ইম্ফলের ফ্লাইট পর পর চার পাঁচ দিন ক্যানসেল হল। তারপর এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলটদের স্ট্রাইক। পরে অবশ্য স্ট্রাইক ভেঙে গেল। নইলে আর এলাম কি করে, রিস্ক না নিয়ে মেসোমশাই একজন

এসকর্ট ঠিক করে আমাকে মন্টিমামার বাগানে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। ইম্ফল থেকে কোহিমা—তারপর ডিমাপুর। ডিমাপুর থেকে বাগান অবধি ট্রেন—তারপরে দমদমে মন্টিমামাদের কোম্পানীর প্লেনে বাগান থেকে।

কাকা কফির কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন—বুঝলাম! কিন্তু এসকর্টটি কে? কোনো নাগা সন্ন্যাসী নাকি?

—অ্যাই অসভ্য! বলে বাবলি বকল কাকাকে।

কাকীমা বললেন, তোর কাকুর বরাবরই কথাবার্তা ওরকম। কার সঙ্গে কি বলবে তার কোনো বাছ-বিচার নেই।

কাকা বললেন—কথাটা ঘুরে যাচ্ছে। বললি না তো বাবলি এসকর্টটি কে?

বাবলি বলল, আরে না। নাগা-ফাগা নয়। একেবারে সাদামাটা একজন ক্যাবলা-ট্যাবলা বাঙালি ভদ্রলোক—মেসোমশাইয়ের অফিসেই আছেন।

কাকা ঘুরে বসে বললেন—দাঁড়া দাঁড়া, আমার বন্ধু বাণীরূপের ভাই আছে ওখানে—অভীরূপ। অভী—সে নয় তো? তোর মেসোমশাইয়ের অফিসেই আছে।

বাবলি এবার বেশ ঘাবড়ে গেল। নার্ভাস-নার্ভাস লাগল ওর। ঐ ক্যাবলা লোকটাকে সকলেই এক নামে চিনে ফেলবে তা কি ও ভেবেছিল?

বাবলি ঢোক গিলে বলল—সে ভদ্রলোকের নামও তো অভী। জানি না তোমার বন্ধুর ভাই নাকি? পৃথিবীতে তো সব জায়গায় তোমার একজন করে বন্ধু আর তার ভাইদের রেখেছ। আমি কি করে জানব? কী একটা নাম? অভী! তা কি দুজনের হতে পারে না?

কাকু এবার উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন—তোর এসকর্ট যদি সেই-ই হয় তাহলে তোর অনেক জন্মের তপস্যার ফল রে বাবলি—বুঁচি। বহুদিন ওরকম ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র কেউ বেরোয় নি তা জানিস? লন্ডনের স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে?

বাবলির একবার মনে হল মাথা ঘুরে পড়ে যাবে ও।

প্রতিবাদ করে ও বলল—এ তাহলে অন্য কোনো অভী হবে। এ বিলেত-ফিলেত যায় নি। একেবারে ক্যাবলা গণেশ গো কাকু। এ সে হতেই পারে না। তাছাড়া, লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে পাস করা ছেলে ইম্ফলে পচতে যাবে কেন?

কিন্তু কাকা ছাড়বার পাত্র নন।

ইতিমধ্যে মাল এসে পৌঁছনোর খবর অ্যানাউন্সড হয়েছে।

ওরা সকলে উঠে সেদিকে এগোল।

কাকু আবার বললেন—কেমন দেখতে বল তো?

বাবলি বলল—ভীষণ আনইমপ্রেসিভ চেহারা। তারপর বলল, এরকম এরকম দেখতে।

সব শুনে কাকা বললেন—করেছিস কি? অভীকে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে তুই ত্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করে বেড়িয়েছিস? ওর পা-ধোয়া জল নিয়ে এলি না কেন এক ঘড়া। সকাল-বিকেল খেলে তোর মগজ খুলত। অভীকে আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি। ওর সবচেয়ে বড় গুণ যে ও একেবারে আনঅ্যাসুমিং, ওকে দেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। কোনো এয়ার-ফেয়ার নেই নিজের সম্বন্ধে। একেবারে খাঁটি ছেলে। তুই জানিস না, ও কত বড় গর্ব আমাদের। যাক, তোর এই অ্যাচিভমেন্টটা তোর আই আর এস-এ সাকসেসফুল হওয়ার অ্যাচিভমেন্টের চেয়েও বড়।

কোন অ্যাচিভমেন্ট?

বিস্ময়ে শুধোল বাবলি।

এই অভীর সঙ্গে ত্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করার অ্যাচিভমেন্ট।

কাকীমা এতক্ষণে কাকার কথায় মজা পেয়েছেন। উনি হাসছিলেন।

বললেন, অভীকে আমিও চিনি। তুই যা মেয়ে তাকেও ছাড়িস নি বোধহয়—নাকানি-চোবানি খাইয়েছিস নিশ্চয়ই।

বাবলি একেবারে চুপসে গিয়েছিল। বলল, আরে না না। আমি কি সকলের সঙ্গে ইয়ার্কি মারতে পারি নাকি? তারপর চিনি না জানি না। কি যে বলো তুমি কাকীমা।

কাকীমা বললেন, কী জানি! তোকে কিছুই বিশ্বাস নেই।

মালপত্র কালেক্ট করে এয়ারপোর্ট থেকে ওরা যখন বেরোল তখন বাইরে জোর বৃষ্টি হয়ে আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দিল্লি এয়ারপোর্টের সামনেটাতেই ভীষণ জল জমে। ঐ জায়গাটা সাবধানে পেরিয়ে কাকা গাড়ির স্পীড বাড়ালেন।

হু-হু করে হাওয়া আসছিল—ঠাণ্ডা। বাবলি সামনের সীটে কাকার পাশে বসেছিল। কাকীমা পিছনে বসেছিলেন।

কাকা কাকীমা কি সব টুকরো-টাকরা কথা বলছিলেন। বাবলির কানে যাচ্ছিল না। বাবলি মনে মনে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল।

বাবলির মনের চোখে ভেসে উঠেছিল সেই নাগা পাহাড়ের কাঠুরের ঘর। সেই ভয় ; সেই ঠাণ্ডা। সেই সবকিছু মনে পড়ে যাচ্ছিল আর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল কাঠের আগুনের সামনে বসে থাকা, একটি ছেলেমানুষ সরল, আন্তরিক ; দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন চিন্তিত মুখ। বাইরের অন্ধকারে পাশফেরানো মাথা-ভরা এলোমেলো চুলে-ভরা একটি শিশুসুলভ মুখ।

পুরোনো দিল্লির ভাঙা দুর্গ-টুর্গ তোরণ-টোরণগুলোর মধ্যে অন্ধকারে ভিজে-হাওয়াটা শিস তুলছিল। বাবলির বুকের মধ্যেও কিসের যেন শিসই উঠছিল।

বাবলি জানে না, বাবলি কি করবে? কি ওর করা উচিত? ভয়ে, আনন্দে, অনুশোচনায় বাবলির গলা শুকিয়ে আসতে লাগল।

হঠাৎ কাকীমা বললেন, কাল সকালে একবার কালীবাড়ি যাব ভাবছি। তুই যাবি বাবলি? না। তুই তো আবার মেমসাহেব।

বাবলি ভগবান-টগবান মানে না। বাবলি বরাবরই বলে, ট্র্যাশ। এমন কি এ পর্যন্ত কোনো পরীক্ষা দেওয়ার সময়ও কোনো ঠাকুর দেবতার ছবিকেও প্রণাম করে যায় নি বাবলি।

কিন্তু বাবলি বলল, বেশ তো কাকীমা। যাবো তোমার সঙ্গে। পরশুদিন নতুন জীবন আরম্ভ হবে—নতুন চাকরি। একবার না হয় তোমার সঙ্গে যাবোই—তোমার যখন এতই ইচ্ছা।

কাকা স্টিয়ারিং ধরে হেডলাইট জ্বালানো পথে সামনে চেয়েছিলেন। বাবলির এই কথায় হঠাৎ চকিতে মুখ ঘুরিয়ে বাবলির দিকে তাকালেন।

তাকিয়েই আবার রাস্তার দিকে মুখ করলেন।

বাবলি বলল, কি কাকু, কি হল?

কাকা একটা মোড় নিতে নিতে বললেন, কিছু হয় নি, কিন্তু হতে পারে!

কাকীমা চোখে রাতে ভালো দেখতে পান না—কোনোদিনই না—বললেন, কি গো? রাস্তায় কোনো গোলমালের কথা বলছ?

কাকা হেসে উঠলেন হো হো করে।

বললেন, গোলমাল! তবে রাস্তায় নয়, একেবারে ঘরের মধ্যেই মনে হচ্ছে। কেস খুব গড়বড়।

বাবলি যেন কিছু বুঝতে পারে নি এমনভাবে বলল, কাকুমণি, তুমি কখন যে কি বল, আর কি ভেবে কি বল, তুমিই জান। তোমার এই হেঁয়ালী-হেঁয়ালী কথা থামাও তো! তাড়াতাড়ি বাড়ি চল। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

কাকা আবার হাসলেন। বললেন, খিদে আমারও পেয়েছে। বলেই সুর করে নাকি নাকি গলায় বললেন, হাঁউ-মাউ-খাঁউ, চেনা মানুষের গন্ধ-পাঁউ।

বাড়ি পৌঁছে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল বাবলি।

কাকীমাকে বলল, কাকীমা সেই ভোরবেলা চা-বাগানে চান করে বেরিয়েছি। ঘেন্না করছে। ভালো করে চান করব। চান করে তারপরে খেতে বসব। তুমি কিষাণ সিংকে খাওয়ার ঠিকঠাক করতে বল।

ঘরে ঢুকেই বাবলি আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ধিক্কার দিল বাবলি। আয়নায় ওর পাশে ও ঝুমার চেহারাটা কল্পনা করে নিল। কল্পনায় ওর পাশে ঝুমাকে দেখে ও লজ্জায় মরে গেল। ছিঃ ছিঃ, কি বিচ্ছিরী ফিগার বাবলির। আর মুখশ্রীই বা কি। তাকানো যায় না। ঈ-শ-শ!

এই প্রথম, প্রথমবার জীবনে, সে নিজে সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তা নয় বলে, তার ফিগার ভালো নয় বলে বাবলি আক্ষেপ করল। আজ এই মুহূর্তে ও জানতে পারল, মেয়েদের আর যে গুণই থাক, চিত্রাঙ্গদা হলে, মেয়েরা মেয়েসুলভ সৌন্দর্যের অধিকারী না হলে, অর্জুনরা, কোনো অর্জুনই তাদের মুখে নারীকে আবিষ্কার করতে পারে না।

এই-ই প্রথম জীবনে প্রথমবার বাবলি হেরে যাবার, ফেল করার ভয় পেল। এ পরীক্ষায় যে ওর কখনও বসতে হবে, তা ও বুঝতে পারে নি। স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। ও কি জানত যে, পৃথিবীর সমস্ত মেয়েকেই এই মেয়েলি পরীক্ষায় কোনো-না-কোনো সময় বসতেই হয়।

অভীর অনেক রাত হয়ে গেল ইম্ফল পৌঁছতে পৌঁছতে।

অত রাতে ও আর বাবলির মেসোমশাইয়ের বাড়িতে গেল না। ডিমাপুর থেকে বেরিয়েছিল সকাল চারটাতে, এখন প্রায় রাত এগারোটা বাজে। এই ছোট্ট শহরে রাত এগারোটা অনেক রাত।

বাড়ি ফিরে গাড়ি গ্যারেজ করে, ও বাড়ি ঢুকেই সোজা টেলিফোনের কাছে গেল, তারপর কি মনে করে, দেরাজ খুলে গ্লাসে একটা বড় হুইস্কি ঢেলে, জল নিয়ে, একটা বড় চুমুক লাগিয়ে, এসে ফোন তুলল।

ফোনটা অন্য প্রান্তে বাজছিল।

কুরর্-কুরর্-কুরর্ করে। কোনো প্রোষিতভর্তৃকার কাছে স্বামীর খবর বয়ে নিয়ে আসা কোনো রূপকথার পাখির মতো ফোনটা ডাকছিল।

অনেকক্ষণ পরে বাবলির মাসী ফোন তুললেন, কি যেন চিবোচ্ছিলেন উনি। বললেন, হ্যালো!

আমি অভী বলছি।

মসলা চিবোতে চিবোতেই বৌদি বললেন, অভী। বাবা বাঁচালে। এত চিন্তায় ছিলাম না আমরা। তোমরা নাকি পথে গাড়ি খারাপ হয়ে নাগাপাহাড়ে ছিলে এক রাত? কি ডেঞ্জারাস ব্যাপার।

অভী অবাক হল। বলল, এ খবর ইতিমধ্যেই এখানে পৌঁছল কি করে?

তোমার দাদা যে আজ সকাল আটটার সময় ডিমাপুরে ট্রাঙ্ককল করেছিলেন। ঐ দস্যিমেয়েই নিশ্চয় জোর করে তোমাকে সেদিনই যেতে বলেছিল ডিমাপুর? নইলে তোমাকে তো তোমার দাদা বার বার বলে দিয়েছিলেন কোহিমায় নাইট স্পেন্ড করতে। কি যে কর না তোমরা? তোমরা দুজনেই সাফিসিয়েন্টলি গ্রোন আপ। তোমাদের কাছ থেকে আরও একটু গুড সেন্স আশা করেছিলাম।

এমন সময় ফোনের পাশ থেকে বড়সাহেবের গলার স্বর শোনা গেল।

—আমায় দাও।

অমনি বৌদি বললেন, নাও, তোমার দাদার সঙ্গে কথা বল।

বড়সাহেব ফোনটা হাতে নিয়েই বললেন, অভী, তুমি নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড। পোর ইয়োরসেলফ আ স্টিফ ড্রিঙ্ক, হ্যাভ আ নাইট হট বাথ, ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করো। অ্যান্ড দেন গো টু বেড।

তারপর একটু থেমে বললেন, কাল অফিসে কথা হবে। গুড নাইট।

অভী জানে বড়সাহেব কাল অফিসে কি কথা বললেন তাকে।

ফাঁকা ঘরে পাইপটা ধরিয়ে উনি বলবেন, কনগ্রাচুলেশনস। উ্য আর এ ফাস্ট ওয়ার্কার।

অভী বাজী ফেলতে পারে এ বিষয়ে।

সোফায় বসে পড়ে হুইস্কির গ্লাসে আরেকটা চুমুক দিয়ে অভী ভাবল এই জন্যই এত উন্নতি হয়েছে ভদ্রলোকের। এই সময় ঐ ভদ্রমহিলার হাত থেকে অভীকে উনি না বাঁচালে ঠায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর প্রলাপ শুনতে হত। সত্যি, মেয়েরা টেলিফোনে বিনা কারণে এত বেশি কথা কেন যে বলে, তা কি কেউ জানে? এর কি কোনো ওষুধ নেই?

হুইস্কিটা শেষ করে উঠে গিয়ে অভী গরম জলের শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল। হিম হিম বর্ষার রাতে। ইম্ফলে।

দিল্লিতে চান শেষ করল বাবলি। বাবলির গা দিয়ে সাবানের গন্ধ বেরোচ্ছিল। বেডরুমের দরজা বন্ধই ছিল। পেলমেটের নিচে পর্দাও। বাবলি কিছু না-পরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়াল। ভালো করে পাউডার মাখলো সারা গায়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। তারপর ভিতরের জামা, প্যান্টি, সায়া পরা হয়ে গেলে একটি হাল্কা সাদা-কালো ফুল-ফল ছাপা শাড়ি পরলো বাবলি।

কেন জানে না। বাবলির খুব ভালো লাগছিল। উড়তে ইচ্ছা করছিল বাবলির পাখির মতো।

পাঁচ

গতকাল অফিসে জয়েন করেছে বাবলি।

দিল্লির মথুরা রোডে সেন্ট্রাল রেভিন্যু বিল্ডিংসয়ে বাবলির অফিস।

লম্বা করিডরের দু'পাশে সারি সারি ঘর। বাবলির ঘরের সামনে ছোট বোর্ড ঝুলছে বার্নিশ করা। তার ওপরে সাদায় লেখা—মিস বি. সেন, আই-আর-এস।

সেদিন তিন-চারটে হিয়ারিং ছিল।

বেশ নার্ভাস লাগছিল বাবলির। কথা খুব কম বলছে। ব্যালান্সশীট ও প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট দেখে দেখে যা যা ডিটেইলসয়ের দরকার নিয়েছে। ধারের জন্য কনফার্মেশন লেটারস ব্যাঙ্কের ওভারড্রাফট-এর লিমিটের চিঠি। গ্রস মুনাফার স্টেটমেন্ট। সানড্রি ডেটরস, সানড্রি ক্রেডিটরস-এর লিস্ট পারচেজ ও সেলের লিস্ট—পঁচিশ হাজার টাকার উপর। ইত্যাদি ইত্যাদি।

উকিলদের মুখ দেখে বাবলি পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে, তাদের মুখে একজন আকাট রংরুটের সামনে যে তারা বসে আছেন এ ভাব পরিস্ফুট।

বাবলি মনে মনে হেসেছে। বলেছে, কিছুদিন যাক। ও কাজ পিক-আপ করে নেবে। ওর আশ-পাশের ঘরে অনেক প্রমোটি অফিসার আছে, বয়সে বড়। ভালো কাজ জানেন। ও আই-আর-এস ডাইরেকট রিক্রুট—তাই ওদের অনেকের চেয়ে ও সিনিয়র, কারণ ও ক্লাস-ওয়ান হয়েই জয়েন করেছে। ও জানে ডিপার্টমেন্টে বেশ মনোমালিন্য আছে এ ব্যাপারে। কিন্তু সেটা ওর দোষ নয়—নিয়মের দোষ।

মাঝে মাঝে ওর মনে হয়েছে যে এই রকম প্রকারভেদ করাটা অন্যায়। তাই প্রত্যেক সিনিয়র অথচ ক্লাস-টু অফিসারের সঙ্গে যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করেছে ও। ও জানে, কাজ শিখতে হলে এঁদের সাহায্য ওর দরকার হবে।

ওর অফিসের যিনি বড়বাবু, বয়স্ক একজন টাকমাথা ভদ্রলোক—হরিয়ানার ভদ্রলোক। তাঁকে দেখে, কথাবার্তা শুনে বাবলির মনে হয়েছে যে তিনি বাবলিকে নিয়ে খুব খুশী। কার্যত তিনিই এখন থেকে অফিসার—কারণ এই অল্পবয়সী বাঙালি মেয়েটি এখনও কাজ কিছুই জানে না। তিনি যা ইচ্ছে করবেন তাই বাবলিকে দিয়ে সই করিয়ে নেবেন। বাবলি তাই প্রথম থেকেই সাবধানে আছে কিছু না-বুঝে না-জেনে সই করবে না।

আজ সকালেই একটা রিফান্ড অর্ডার সই করাতে এনেছিলেন উনি। চল্লিশ হাজার টাকার। বাবলি ভাবল, এত বড় রিফান্ড অর্ডার সই করবার জন্য এত সকালে

ভদ্রলোকের এত তাড়াহুড়ো কেন? বাবলি বলল, পরে হবে। ফাইল-টাইল দেখে নেব একবার।

বড়বাবু বললেন, কমিশনার বলেছেন রিফান্ড ফেলে রাখা চলবে না।

বাবলি বলল, তা হোক।

বাবলি জানতো না যে চাকরির দ্বিতীয় দিনেই এরকম নাজেহাল হবে।

একটু পরে ইন্সপেকটিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার তাকে ডেকে পাঠালেন। ভদ্রলোক গুজরাটি, ভীতু চেহারা। একরকমের চেহারা হয় না, যাদের দেখলেই মনে হয় চাকরি রাখতেই বেচারারা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন ; জীবনের অন্য কোনো দিকে কোনো বিষয়ে আর কোনো ঔৎসুক্য অবশিষ্ট নেই। সেরকম।

ভদ্রলোকের মেজাজ রুক্ষ। বোধহয় স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা নেই, অথবা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন।

উনি বললেন, আপনি কিসের জন্য রিফান্ড ভাউচার সই করেন নি? কমিশনারের কাছে অ্যাসেসীর উকীল কমপ্লেন করেছেন। আপনি কি মনে করেন আপনি নিজের টাকা দিচ্ছেন অ্যাসেসীকে?

বাবলি আমতা আমতা করল।

বলল, তা নয়। আমি ফাইলটা দেখে নিয়ে দিতে চাই—একটু সময় লাগবে স্যার।

উনি বললেন, আমি বলছি ম্যাডাম, এখুনি দিয়ে দিন।

বাবলি বলল, তাহলে আপনি লিখিত অর্ডার দিন স্যার।

ভদ্রলোক অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। বললেন, আপনার সাহস তো কম নয়। কাল জয়েন করেই তো অনেক কথা শিখেছেন। অত কথায় কাজ নেই। এখুনি দিতে বলছি, দিন। লিখিত অর্ডার পাবেন না।

বাবলি বলল, তা হলে সময় লাগবে। ফাইল না দেখে আমি দেবো না।

ভদ্রলোক এবার চুপ করে গেলেন।

বললেন, আপনি যেতে পারেন।

বাবলি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই বুঝল কাজটা ভালো করে নি। কারণ ইনিই বাবলির কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট লিখবেন, যার ওপর ওর উন্নতি নির্ভর করবে। কিন্তু বাবলি মনে মনে বলল, যা হবে, তা হবে। নিজে লিখে দেবেন না, খালি টেলিফোনে আর মুখে মুখে ছড়ি ঘোরাবেন—তাতে হবে না। রিফান্ড অর্ডার সই করবে বাবলি, পরে কোনো গোলমাল হলে এ-জি অডিট ধরবে তাকে—। ঝামেলা হলে বাবলিরই হবে। ওঁদের কি?

বাবলির সহকর্মীরা সকলেই বলছিলেন যে অফিসারদের কাজ করার ইচ্ছা প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গেছে গুচ্ছের রিপোর্ট-রিটার্নের ঝামেলায় আর এই অডিটের মাতব্বরীতে। বেশির ভাগ রিটার্নই ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলা যায়। তা সরকারের পয়সা। নষ্ট হয় অফিসারদের আত্মবিশ্বাস, করদাতাদের বিশ্বাস সরকারের ওপর। এ সময়ে আসল কাজ করলে অনেক কাজ করা যেত।

বাবলি মনে মনে ভাবে, (যেমন সমস্ত তরুণ অনভিজ্ঞ লোকই নির্দ্বিধায় ভাবে যে) সে নিজের হাতে হাল ধরলে, যখন ও উঁচু পদে যাবে তখন এসব অব্যবস্থা ঠিক করে দেবে।

কিন্তু দুদিনেই বাবলি বুঝতে পারছে যে সরকারি চাকরিতে নিজের কর্মদক্ষতা, নিজের স্বাধীনতা, নিজের মতামত নিয়ে টেকা যায় না। একটি বিরাট মেশিনের, যে মেশিনের কোনো কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই, কিছু উৎপাদনের ক্ষমতা নেই, তার একটা ছোট্ট অনামা যন্ত্র হিসেবে তাকে সারাজীবন এখানে সেঁটে থাকতে হবে। মাসান্তে কিছু টাকার জন্য।

দুদিনেই বাবলির ঘেন্না হয়ে গেছে এই চাকরির ওপর।

এখন ওর এই-ই জীবন। অফিস করে। বাড়ি আসে। বাড়ি ফিরে ভালো করে গা-ধোয়া, তারপর কাকা কাকীমার সঙ্গে জমিয়ে বসে চা খায়। তারপর নিজের ঘরে অথবা দোতলায় বারান্দায় বসে থাকে আলো নিভিয়ে।

দিল্লিতে এই জুন-জুলাই মাসটাই সবচেয়ে খারাপ। এমন ভ্যাপসা গরম পড়ে যে সে বলার নয়। অবশ্য বৃষ্টি হলেই খুব প্লেজেন্ট।

ওদের বাড়ি হাউজ-খাস এনক্লেভে। বারান্দায় বসে দূরের ফাঁকা জমি, পোড়ো-বাড়ি চোখে পড়ে। ও যখন ছোট ছিল, তখন এসব বাড়ি হয়ে যায় নি চতুর্দিকে। বিকেলে রুক্ষ মাটি আর পাথুরের জমিতে গজিয়ে-ওঠা নানান গাছ-গাছালির আড়াল থেকে তিতিরের ডাক শোনা যেত—যখন সন্ধ্যে হয়ে আসত। বেশ নিরিবিলি ছিল তখন অঞ্চলটা।

মনে পড়ে যায়, ও যখনই একা থাকে তখনই মনে পড়ে যায় অভীর কথা। বারান্দায় অন্ধকারে বসে প্রায়ই অভীর কথা ভাবে বাবলি। বেশ খারাপ আছে অভী। এতদিন হয়ে গেল একটা চিঠি লিখতে পারল না ওকে। ও-যে লিখতে পারত না, তা নয়। কিন্তু ওর লজ্জা লজ্জা করে। লজ্জা করাটা মেয়েদের ধর্ম। মেয়েদের স্বভাব। লজ্জা ভাঙাটা পুরুষদের কর্তব্য। তা-ই প্রথম চিঠি অন্তত অভীই লিখতে পারত। পত্রালাপের সূত্রপাত ঘটলে তারপর বাবলি কিপ্ আপ করত।

কে জানে? ঝুমা দেবী ইতিমধ্যেই তার কুহকজাল ছড়িয়েছেন কি না অভীর

ওপর। ওসব মেয়ে সব পারে। ওদের কাজই এই। ভালো ভালো ছেলের মাথা খাওয়া। বাঘিনীর মতো এক এক করে মাথা খেয়ে ওরা নম্বর গোনে। গতযৌবনা হয়ে গিয়ে বারান্দার মোড়ায় বসে পায়ের ওপর পা তুলে যৌবনে ওরা কতজনের মাথা চিবিয়ে খেয়েছিল, কতজনকে পাগল করেছিল, কতজন ওদের জন্য আত্মহত্যা করেছিল, কতজনের ঘর ভেঙেছিল ওরা, তার হিসাব করে।

বাবলি জানে না ওরা কী চায়? বোধ হয় ওদের পুরুষ ভোলানোর ক্ষমতা বারংবার প্রয়োগ না করলে ভোঁতা হয়ে যায় ; মরচে পড়ে যায়। তাই বোধহয় ওরা কোনো সময় নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না।

গতকাল বাবলি ইন্দিরা চাওলাকে ফোন করেছিল, ও দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস পড়াচ্ছে। ইন্দিরার সঙ্গে ঝুমার যোগাযোগ আছে। ইন্দিরাই বলছিল যে, ঝুমা ইম্ফল যাবে বেড়াতে। সামনের মাসে গিয়ে নাকি পনরো দিন থাকবে। জায়গাটা নাকি চমৎকার লাগে ওর।

বাবলি কি করবে জানে না। ও কি অভীকে সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছে? ভালোবাসা মানে কি? কারো জন্য মন খারাপ হওয়া? কাউকে বার বার মনে পড়া? কারো সঙ্গে নিজের মতের মিল হওয়া, নিজের রুচির মিল, সখের মিল হওয়া? জানে না, বাবলি তা জানে না।

তবে বাবলি এ কথা বোঝে, ঝুমার সঙ্গে দমদম এয়ারপোর্টে দেখা না হলে, কাকা অভীর এত প্রশংসা না করলে, অভীর প্রতি তার যে দুর্বলতা জন্মেছিল সেটা ও ভুলে যেতে পারত। অভীকে ছেড়ে এসে আউট-অফ-সাইট, আউট-অফ-মাইন্ডে বিশ্বাস করবে ভেবেছিল। কিন্তু সে বিশ্বাস আর রইল না। চোখের বাইরে সে থাকতে পারে, কিন্তু মনের বাইরে সে নেই ; মনের মধ্যে সব সময়ই ঘোরে ফেরে।

ভিতর থেকে খাওয়ার ডাক এল। বাবলি খাওয়ার ঘরে গিয়ে যে চেয়ারে ও রোজ বসে, সে চেয়ার টেনে বসল।

কাকা পায়জামা পাঞ্জাবি পরে এলেন চানটান করে। গল্প-গুজব করতে করতে খাওয়া শেষ হলে কাকীমাকে কাকা বললেন, আমার সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করে আনো তো ড্রয়ার থেকে, শোওয়ার ঘরের।

কাকীমা উঠে যেতেই কাকা চোখ বড় বড় করে বললেন, কি খাওয়াবি বল্?

বাবলি অবাক হল। বলল, কেন? কিসের জন্য?

কাকা বললেন, অভী আসছে তিন দিনের জন্য দিল্লিতে। দিল্লি ইউনিভার্সিটির একটা সেমিনারে। অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে। এখনও দু'মাস।

তারপরই বললেন, কি বুঝলি?

বাবলি মুখের ভাব একইরকম রেখে বলল, আসছে তো আসছে। তোমার বন্ধুর ভাই আসছে তাতে তুমি উল্লসিত হও। আমার তাতে কি?

কাকা, কপট বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, সে কি রে, তোর কোচোয়ান আসছে, তোর বডিগার্ড—তোর এত দেখাশোনা করল আর তুই নেমন্তন্ন করবি না।

বাবলি বলল, তুমিই তো আমার গার্জেন। নেমন্তন্ন করলে তুমিই করবে।

কাকা বললেন, আমিই গার্জেন। তা হলে বেশ। এ কথাটা ভবিষ্যতে মনে করে রেখ। গার্জেনের পারমিশন ছাড়া এক পা এদিক-ওদিক করেছ তো পা ভেঙে দেব।

বাবলি আনন্দে, লজ্জায় সব কিছু মিলিয়ে হেসে উঠল। বলল, হ্যাঁ, পা ভাঙতে দিচ্ছি তোমাকে।

পরদিন বাবলির কাছেও চিঠি এল বাবলির মাসীর, ইম্ফল থেকে।

উনি লিখেছেন ঃ

বাবলি,

অভী দিল্লি যাচ্ছে। তিনদিন থাকবে। ওকে একদিন ভালো করে নেমন্তন্ন খাওয়াস। তোর জন্য এত কিছু করেছে ও। তুই তো কম জ্বালাস নি। ওর সঙ্গে নিমেষ (কাকার নাম) আর বাণীর (কাকীমার নাম) জন্য দুটো মণিপুরী খেস্ পাঠাচ্ছি। ওদের বলিস, মাঝে মাঝে চিঠি দিস না কেন? তোর যে কী স্বভাব বুঝি না। যখন কাছে থাকিস, তখন তো সব সময় গলায় ঝুলে থাকিস। মনে হয় আমায় না দেখলে একদিনও বুঝি বাঁচবি না। আর চোখের আড়াল হলে মনে করার উপায় থাকে না যে একসময় মাসী বলে কাউকে চিনতিস!

—ইতি রূপু মাসী।

বাবলি চিঠি পড়ে মনে মনে লজ্জিত হল। সত্যিই ওর বড় দোষ। চিঠি লিখতে যেন জ্বর আসে গায়ে।

অগাস্টের প্রথম সপ্তাহ। দু মাস বাকি আছে এখনও।

বাবলি একটা দারুণ কাজ করল। কাকাকে ধরে কাকার এক বন্ধুর মাধ্যমে (যিনি দিল্লি জিমখানা ক্লাবের মেম্বার) জিমখানা ক্লাবে টেনিস খেলার বন্দোবস্ত করে ফেলল, তাঁর গেস্ট হিসাবে।

কাকা খুশী হলেন। কাকীমা খুশী হলেন না। বললেন, যখন খেলাধুলার বয়স ছিল, তখন ঘরে বসে বই পড়েছিস, এখন বুড়ো বয়সে হাত-পা ভাঙার দরকার কি?

যে যাই-ই বলুক, বাবলির স্বভাব নয় নিজের অমতে চলা কি অন্যান্য কারোরই মতামত গ্রাহ্য করা। তাই সে ছুটির দিনে অনেকক্ষণ এবং উইকডেজ-এ সকালে

রোজ এক ঘণ্টা করে টেনিস খেলা শুরু করে দিল। মার্কারের সঙ্গে খেলত। বেশ লাগত। সকালের রোদে দৌড়াদৌড়ি করে খেলতে—হার্ড-কোর্টের মোরামের গন্ধ, টেনিস বলের গন্ধ, হাওয়াতে বেড়ার ধারের লতানো ফুলের ভেসে আসা গন্ধ এসব মিলে ভারী ভালো লাগতে লাগল বাবলির। দুঃখ হল, এতদিন কোনো খেলাধুলা করে নি বলে।

এক মাস পরেই নিজের ঘরে নিজেকে অনাবৃত করে দেখল, বাবলির চেহারায় সূর্যের আশীর্বাদ লেগেছে। কলার বোনের কাছে, দু'বুকের ওপর দিকটা—ঘাড় গলা সব রোদে পুড়ে বাদামী হয়ে গেছে। বাদামী হয়ে গেছে পায়ের নীচে পায়ের যে অংশটুকু অনাবৃত থাকে।

বাবলির সমস্ত শরীরে মনে একটা নতুন পুলক লেগেছে। শুধু বসে থাকতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে বা শুয়ে থাকতেই যে এত আনন্দ, যারা কখনও খেলাধুলা করে নি, তারা বোধহয় কখনও জানে নি।

বাবলির ওজন কমে গেছে এক কেজি দু'সপ্তাহেই। খেলার সঙ্গে সঙ্গে ডায়াট কন্ট্রোলও করছে ও। পুরো দু'মাস খেলার পর মার্কার গ্যারান্টি দিয়েছে পাঁচ কেজি কমে যাবে।

মুখে বেশি মাংস থাকলে মানুষের মুখের অভিব্যক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

আশ্চর্য! বাবলি এতদিন এসব নজর করে দেখে নি।

রোজ সকালে ক্লাবে খেলে, তারপর ক্লাবেই চান করে জামাকাপড় পরে বাবলি যখন ওখান থেকেই সোজা অফিস যেত, তখন দারুণ ফ্রেশ লাগত বাবলির। চন্‌চন্ করে খিদে পেত। সমস্ত শরীর হাল্কা হাল্কা মনে হত।

অফিসে পৌঁছে সকাল-সকাল ক্যান্টিন থেকে টোস্ট আর ডিম আনিয়ে খেত। লাঞ্চে বাড়ি থেকে কাকীমা কিষাণ সিংকে দিয়ে খাবার পাঠাতেন। হট্ কেসে করে।

বাবলির দিনগুলো এমনি করে হৈ হৈ করে হেসে খেলে কাজ করে কি করে যে কেটে যাচ্ছিল তা বাবলি জানে না।

বাবলি এখন কিছুই জানে না। জানতে চায় না। বাবলির সমস্ত মন এখন উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে ক্যালেন্ডারের দিকে। অগাস্টের তিন তারিখটা ও সবুজ পেন্সিল দিয়ে রাঙিয়ে রেখেছে ওর অফিসের ডায়েরীতে।

তিন তারিখে অভী আসবে। চার এবং পাঁচ তারিখের জন্য বাবলি ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্ত দিয়ে রেখেছে। বাবলি জানে না কেন, বাবলির মন বলছে যে, ঐ দু'দিন ওর ছুটি নেওয়ার প্রয়োজন হবে। আর তখন যদি না পায়, তাই আগে থেকেই বাবলি ছুটি চেয়ে রাখছে।

বাবলি এখন অগাস্টের তিনটি দিনের প্রতীক্ষায় বেঁচে আছে। অনিমেষে সেই দিকেই চেয়ে আছে।

বাবলি ভাবে, বাবলিটা, সেই ডোন্টকেয়ার বেপরোয়া, স্বনির্ভর বাবলিটা কেমন বোকা-বোকা হয়ে গেছে। নিজের আনন্দ, নিজের সুখ, নিজের সমস্ত অস্তিত্বের জন্য মনে মনে কেমন অসহায়ের মতো অন্য একজন দূরের লোকের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে তাকে। একজন ক্যাবলা-লোকের ওপর ঃ এমন স্মার্ট বাবলির।

দেখতে দেখতে অগাস্টের তিন তারিখটা সত্যিই একদিন এসে গেল।

সময়ের যে পাখা আছে। সময় যখন ওড়ে, উড়তে চায়, তখন সবুজ দিনগুলোকে মুখে করে কোনো হলুদ পাখির মতো সময় উড়ে যায়।

বাবলি প্রথমে ঠিক করেছিল কাকুর গাড়িটা নিয়ে নিউ-দিল্লি স্টেশনে যাবে অভীকে রিসিভ করতে। তারপরে ভাবল হয়তো সেটা বাড়াবাড়ি হবে। বাড়াবাড়ি হলেও বাবলি তবু যেত, যদি না কাকুর বন্ধু এবং তাঁর স্ত্রী স্টেশনে যেতেন। অবশ্য তাঁরা তো যাবেনই। অভী তো তাঁদেরই আপনজন, ও তো বাবলির কেউ না। কেউ হয়তো হবেও না। এসব অনেক কিছু ভেবে শেষ পর্যন্ত স্টেশনে না গিয়ে রোজকার রুটিন মতো ক্লাবে গেল বাবলি, তারপর অফিসে।

আজ ও আরো বেশিক্ষণ খেলল। ব্যাকহ্যান্ড ও ফোরহ্যান্ড স্ট্রোকগুলো যত ভালো করে পারে, যতখানি সুয়িং করে পারে নিল। খামোখা সারা কোর্টময় ও শৃঙ্গাররতা হরিণীর মতো ছুটোছুটি করে বেড়াল। ও যেন এই একদিনের খেলায়ই সুন্দরী হয়ে যাবে, ওর শরীরের যেখানে যেখানে এখনও যতটুকু বাড়তি মেদ আছে সেটুকু যেন একদিনেই ও ঝরিয়ে ফেলবে এমন ভাবতে লাগল।

অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেই কাকীমা বললেন, অভী ফোন করেছিল। আজ এবং কাল ও খুব ব্যস্ত থাকবে, আসতে পারবে না। পরশুদিন রাতে ও খেতে আসবে এখানে। পরদিনই ইম্ফল চলে যাবে, সকালের প্লেনে। তুই কেমন আছিস জিজ্ঞেস করল। ও সন্ধ্যেবেলায় দিল্লি ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসরের বাড়িতে থাকবে তোকে সেখানে ফোন করতে বলেছে।

বাবলি মুখে বলল, কে এখন ফোন করবে? আমি এখন চান টান করব, কি খাব, তারপর ফোন করার কথা ভাবা যাবে। অত ব্যস্ত লোক যখন, তখন দয়া করে ফোনও না করলেই পারতেন।

কাকীমা হাসলেন। বললেন, তুই কি হাওয়ার সঙ্গেও ঝগড়া করবি নাকি?

বাবলি বলল, ফোন নম্বরটা কোথায় লিখে রেখেছ?

কাকীমা বললেন, টেলিফোনের সামনেই রাখা আছে, প্যাডে।

বাবলি বলল, থাক দেখা যাবে, ফোন করবো কিনা।

আসলে বাবলির তক্ষুনি ইচ্ছা করছিল ফোন করতে। কিন্তু ফোনটা বসার ঘরে এবং কাকীমা বসার ঘরে বসেই বই পড়ছেন। ভালো করে কথা বলা যাবে না কাকীমা থাকলে।

বাবলি ভাবল, একটু পরে নিরিবিলি দেখে ও ফোনটা করবে।

বাবলি চান করতে ঢুকল বাথরুমে।

শাওয়ারের নিচে গিয়ে দাঁড়ানোর পরই কাকীমা দরজা ধাক্কালেন। বললেন, অভী আবার ফোন করছে। তোকে চাইছে।

বাবলির সমস্ত শরীর আনন্দে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

মুখে বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে বলল, বল যে আমি চান করছি, আমার বেরোতে দেরি হবে।

কাকীমা কি একটা বিরক্তসূচক কথা বললেন বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে, বোঝা গেল না। তারপর চলে গেলেন।

বাবলির সমস্ত মন গুনগুনিয়ে উঠল। বাবলি গান জানে না। জানলে ও খুশী হত। ওর মনে অনেক সুর আছে ও গান ভালোবাসে, কিন্তু ভগবান ওর গলায় সুর দেন নি। বাবলি সারা শরীরে সাবানের ফেনার বুদ্বুদ তুলে মনে মনে নিরুচ্চারে গান গাইতে লাগল।

চান করে বেরিয়ে জামাকাপড় সবে পরেছে, টেলিফোনটা আবার বাজল।

কাকীমা বোধহয় রান্নাঘরে গিয়েছিলেন, কি বাথরুমে গিয়েছিলেন, হয়তো ওঁদের ঘরে। বাবলি দৌড়ে গিয়ে ফোনটা ধরল।

হ্যালো। ওপাশ থেকে অভীর গলা শোনা গেল।

বাবলি যন্ত্রচালিতের মতো ওদের বাড়ির নম্বরটা বলল।

অভী লাজুক লাজুক গলায় বলল, বাবলির সঙ্গে কথা বলতে পারি?

বাবলি হাসি চেপে বলল, আপনার নাম জানতে পারি?

অভী বলল, আমার নাম অভী?

ও। বাবলি বলল। তারপর বলল, ভেবেছিলাম আমার গলার স্বরটা চিনবেন। আমি কিন্তু আপনারটা চিনেছিলাম।

অভী হাসল। বলল, আমিও চিনেছিলাম, তবে আপনার মেজাজ-টেজাজ কেমন আছে জানবার জন্যে প্রথমেই বলি নি যে আপনাকে চিনেছি।

বাবলির যেমন স্বভাব, ও হঠাৎ চটে উঠে বলল, কেন? আমার মেজাজটা কি

দেখলেন আপনি? আর এতই মেজাজী লোক যদি আমি, তো আমাকে এতবার ফোন করা কেন?

অভী আবার হাসল। বলল, রাঃ রে, কর্তব্য নেই বুঝি? আপনি হলেন গিয়ে আমার বসের শালীর মেয়ে। আপনার খোঁজ নেওয়া আমার কর্তব্য নয়? আপনার জন্য আনারসের আচার পাঠিয়েছেন আপনার মাসীমা—আর খেস্‌স্‌। এখন কি আপনি বাড়ি থাকবেন?

বাবলি বলল, আমি বাড়ি থাকব, কিন্তু শুনলাম তো আপনার আজ এবং কাল ফুরসতই নেই। পরশুদিনের আগে এখানে আসা নাকি আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

সেরকম বলেছিলাম, কিন্তু প্রায় ঝগড়া করেই এখান থেকে নেমন্তন্ন না খেয়ে চলে যাচ্ছি। অনেক মিথ্যা কথা বলতে হল। আপনার জন্য।

আমার জন্য আপনাকে তো আমি মিথ্যা কথা বলতে বলি নি। আমার কথা ভেবে তো আপনার এত মাস ঘুম হয় নি। বেশ কথা শিখেছেন কিন্তু আপনি। এতখানি পথ আমাকে নিয়ে এলেন ইম্ফল থেকে ডিমাপুরে, তখন তো জানা যায় নি যে এত কথা বলতে পারেন এবং এত গুছিয়ে?

অভী একটু চুপ করে থাকল।

তারপর বলল, তা ঠিক। ওখানে জানা যায় নি। ওখানে আপনি থাকতে কিছুই জানা যায় নি। যা কিছু জানার, যা কিছু বোঝার, সব আপনি চলে আসার পর জানা গেছে, বোঝা গেছে। তাছাড়া মিথ্যা কথাটা হয়তো শুধু আপনার জন বলি নি।

তবে? কার জন্য বলেছিলেন?

অভী অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

তারপর বলল, আমার জন্যেও। হয়তো শুধু আমারই জন্যে। আজ সকালে এখানে এসে অবধি আপনাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল। কেন হঠাৎ এই তীব্রতা আমার ইচ্ছার তা নিজেই জানি না। ভারী জানতে ইচ্ছে ছিল কেমন আছেন? বদলে গেছেন কি না?

পরক্ষণেই আবার অভী বলল, আপনার ইচ্ছে করে নি?

বাবলি বলল, কি ইচ্ছা?

—না, কোনো ইচ্ছা। কোনোরকম ইচ্ছা।

বাবলি আবার বলল, না। আমার কিছু ইচ্ছা করে নি। তবে আপনার যদি কোনো ইচ্ছা থাকে, তা পূরণ করার কথা কন্‌সিডার করতে পারি।

অভী হাসল। বলল, বাবাঃ, আপনি বেশ দাম্ভিক আছেন! কি ভাবেন বলুন তো আপনি নিজেকে? আমি কি একেবারেই ফেল্‌না! আমার কি কোনো পরিচয়ই নেই?

আমাকে এরা এখানে বক্তৃতা দিতে নেমন্তন্ন করে এনেছে, তা জানেন?

—জানি। তাতে আমার কি? আমার কাছে আপনি কি, একমাত্র সেটাই আমার জানবার। অন্য লোকে আপনাকে কি করল, না করল, কিভাবে জানল, তা জানতে আমি উৎসুক নই। আপনার কোনো রকম বক্তৃতা শুনতেই আমি রাজি নই।

তারপরই বলল, ফোনেই কথা বলবেন, না আসবেন?

অভী লজ্জিত হল। বলল, আসছি, আসছি। কিন্তু ডিরেকশনটা একটু দিন।

বাবলি কিভাবে ওদের বাড়ি আসতে হবে তা বলে দিল।

অভী ফোন ছাড়তে ছাড়তে বলল, আধ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছাচ্ছি। সিঁড়িতে লালরঙা কার্পেট পেতে রাখুন।

বাবলি হাসল, বলল, আচ্ছা।

অভী বলল, ফোন ছাড়ুন।

বাবলি বলল, না। আপনি আগে ছাড়ুন।

অভী কষ্ট করে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল।

বাবলি ফোন ছেড়ে অন্ধকার বারান্দায় এসে বসল।

বাবলির নিজেকে খুব দুর্বল, অসহায় বলে মনে হচ্ছিল। আনন্দ যে মানুষকে এত বিব্রত করতে পারে, তা ও জানত না। কারো সঙ্গে ফোনে একটু কথা বলার মধ্যে যে এত বিবশ-করা ভালোলাগা থাকতে পারে, তাও ও জানত না।

বাবলি বারান্দায় বসে থাকতে থাকতেই কাকার গাড়ি ঢোকার শব্দ পেল। সিঁড়িতে কাকার পায়ের শব্দটা অন্যদিনের তুলনায় একটু অন্যরকম মনে হল। কাকা যেন খুব তাড়াতাড়ি উঠছেন।

বাবলি বারান্দা থেকে তাড়াতাড়ি ভিতরে এল।

কাকাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। কাকা বললেন, বাবি, তোর কাকীমা কোথায় রে?

—ঘরে। কেন কাকা? কি হয়েছে?

—না। আমাদের অফিসের বিমানবাবুর হঠাৎ সেরিব্রাল থ্রম্বসীস অ্যাটাক হয়েছে। ডক্টর সেনের নার্সিং হোমে পৌঁছে দিয়ে এলাম একটু আগে। অন্যরা নার্সিং হোমেই আছেন। আমাকে ভার দিয়েছে, তোর কাকীমাকে নিয়ে বিমানবাবুর স্ত্রীকে সঙ্গে করে নার্সিং হোমে যাবার।

এই অবধি বলেই কাকু 'এই যে, কোথায় গেলে, শুনছ', বলতে বলতে দৌড়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন।

মিনিট দু-তিনের মধ্যে কাকা কাকীমা বেরিয়ে গেলেন।

কাকীমা বেরোবার সময় বলে গেলেন, কিষাণ সিংকে বলে রাখিস মুরগী, পুরো মুরগীটাই রাঁধতে, আর আমাদের খাবার রান্নাঘরে রেখে শুয়ে পড়তে। আমি গরম করে নেব। তুই খেয়ে শুয়ে পড়িস, বুঝলি, যদি আমাদের দেরি হয়।

কাকা কাকীমা বেরিয়ে যেতে বাবলির মনে খুব আনন্দ হল। একটা নীচ স্বার্থপর আনন্দ।

কাকার অফিসের বিমানবাবুকে বাবলি চেনে। ভদ্রলোক আশা করি ভালো হয়ে উঠবেন। ভদ্রলোকের ভালো হয়ে উঠতেই হবে, কারণ বাবলির প্রতি তিনি যে কনসিডারেশন দেখিয়েছেন তার তুলনা নেই। ঠিক যে সময় অভী আসবে তার একটু আগে কাকা-কাকীমাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে হল তো তাঁরই অসুস্থতার জন্যে—বাবলিকে একা থাকার, একা একা অভীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দিয়ে।

বাবলি ঠিক করলো বিমানবাবুর জন্যে খুব প্রার্থনা করবে ভগবানের কাছে।

কাকা-কাকীমা চলে যাবার পর বাবলি আর বারান্দায় বসে থাকতে পারল না। ও একটা বাঁধ্‌নী প্রিন্টের ছাপা শাড়ি পরে ছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখলো। যদিও এ ক'দিন টেনিস খেলে ও যথেষ্ট রোগা হয়েছে, তবুও এই ছাপা শাড়িতে ওর ফিগারটা যথেষ্ট ভালো দেখাচ্ছে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ও নিজেকে নিয়ে নিজের ফিগার নিয়ে বিব্রত হতে হতে নিজেকে কারো চোখে, কারো সামনে সুন্দর করে তুলে ধরবার এই চিরন্তনী মেয়েলি প্রচেষ্টায় নিজে খুব লজ্জিত হল। ওর এতদিন ধারণা ছিল যে ও অন্যদের মতো নয়। তাহলে কি কোনো-কোনো ব্যাপারে, জীবনের কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সব মেয়েরাই একরকম?

অত ভাবার সময় নেই এখন বাবলির। তাড়াতাড়ি শাড়ি সায়া সব খুলে ফেলে একটা নীলরঙের সায়া একটা হাল্কা নীলরঙা সিল্কের শাড়ি বের করল। নীল ব্লাউজ। সিল্কের শাড়ি গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকে। রোগা দেখায় যারা মোটার দিকে ; তাদের। তাড়াতাড়ি করে শাড়ি পরে ফেলে নীলরঙা মাড্রাসী সিঁদুরের একটা টিপ পরে নিল ও। গায়ে একটু 'ইন্টিমেট' স্প্রে করে নিল।

শাড়ি পরা শেষ হতে-না-হতেই কলিং বেলটা বাজল।

বাবলি দৌড়ে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। নিচে পৌঁছে দরজা খুলল।

অভী দাঁড়িয়েছিল দরজায়। একটা ছাই-ছাই রঙা টেরিকটের বিজনেস-স্যুট পরে।

বাড়ির বাইরের আলোয় অভীকে খুব লম্বা বলে মনে হচ্ছিল, যত লম্বা ও, তার চেয়েও অনেক বেশি। বাবলির মাথাটা ওর বুকের কাছে ছিল।

অভী সিঁড়িতে লাল কার্পেট পেতে রাখতে বলেছিল। কিন্তু তার বদলে বাবলি

ওকে এক সুগন্ধি ফিকে নীল অভ্যর্থনা দিল।

অভীর অবাক চোখে ও বাবলিকে চিনতে পারছিল না। সেই একটু মোটার দিকে মিষ্টিমুখের মেয়েটি যেন লকলকে সাপের মতো হয়ে গেছে। রংটা কালো হয়েছে আগের থেকে।—কালো নয়, বাদামী। আর চোখ-মুখে, সমস্ত শরীরে কী দারুণ এক চিকন আভা লেগেছে।

অভী হাসছিল। কথা বলছিল না।

বাবলিও হাসছিল। বলল, কি? অত হাসার কি হয়েছে?

অভী বলল, না। এখন তো দেখছি বাংলা সাহিত্যের নায়িকা হতে কোনো বাধা নেই আপনার।

—মানে? ভুরু তুলে বাবলি জিজ্ঞেস করলো।

অভী হেসে বলল, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? আপনি বলেছিলেন বাঙালি লেখকদের ওপর আপনার ভীষণ রাগ, কারণ নায়িকামাত্রই ফিগার ভালো হয়, দারুণ সুন্দরী হয়। এখন কিন্তু কোনো নিন্দুকও আপনার ফিগার ভালো নয়, একথা বলবে না।

বাবলি বলল, কি? এখানেই দাঁড়িয়ে থাকা হবে? না ভিতরে যাওয়া হবে? আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনিই যেন কোনো সাহিত্যিক ; কি কবি। মানে আগে ছিলেন না ; এখন হয়ে গেছেন।

অভী বাবলির পাশে পাশে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, মনে মনে সকলেই কবি। কারো কবিত্ব মনেই থাকে, আর কারো বা কাগজে। তফাত কি?

—আমি জানি না। তারপর বলল, এরকম দু'দিনের হ্যারিকেন ট্যুরে আসার কি মানে হয়? আপনার জন্যে আমি দু'দিন ছুটি নিয়েছিলাম, আপনি জানেন? আমার দু-দুটো দিনের ক্যাজুয়াল লীভ নষ্ট করলেন তো আপনি?

অভী অবাক হয়ে তাকাল।

তারপর ব্যথিত চোখ তুলে বলল, স্যরি, সত্যিই তো। ভেরী স্যরি। তবে কিছুই কি নষ্ট হয় বলে আপনি বিশ্বাস করেন? আমি কিন্তু করি না। কিছুই নষ্ট হয় না। সবই প্রাপ্তির ঘরে জমা পড়ে, জমা থাকে। কি? থাকে না?

—আমি অত জানি না।

বাবলি বলল অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে।

বসবার ঘরে গিয়ে বসল ওরা।

বাবলি বলল, কি খাবেন বলুন?

অভী বলল, কিচ্ছু না। আপনার কি ধারণা কিছু খাওয়ার জন্যেই অন্য লোকের

কাছে মিথ্যা কথা বলে আমি দৌড়ে এলাম এখানে?

বাবলি মুখ তুলে বলল, তবে? কেন এলেন? শুধুই কর্তব্য করতে?

বাবলির উজ্জ্বল কালো চোখ দুটি, তীক্ষ্ণ নাক, উঁচু হয়ে থাকা কণ্ঠার হাড় দুটো, রোদ-লাগা বুক, বুকের পেলব ভাঁজটি সমস্ত এক ঝলকে অভীর চোখে ভেসে উঠল। অভী চোখ নামিয়ে নিল।

বলল, না। আসতে ভালো লাগল। তাই এলাম। শুধু একজনের সামনে অনেকক্ষণ—অনেক—অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকব বলে চলে এলাম।

তারপর বলল, এসে অন্যায় করেছি?

বাবলি মুখ নামিয়ে নিল। কথা বলল না।

দুজনেই কথা বলল না। দেওয়ালের মিউজিক্যাল ঘড়িটা টুং টাং আওয়াজ করে সাতটা বাজাল।

বাবলি বলল, সত্যিই কিছু খাবেন না?

—না। অভী বলল।

তারপর বলল, ভাবতেই ভালো লাগছে, আপনি ছোটবেলা থেকে এ বাড়িতে বড় হয়েছেন, খেলেছেন, দুষ্টুমি করেছেন, শ্লেট-পেন্সিলে অঙ্ক করেছেন—তারপর...।

—তারপর কি? বাবলি চোখ তুলে বলল।

—তারপর একদিন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরেছেন, তারপর এই হঠাৎ আজকের সন্ধ্যেয় এমন আশ্চর্য রহস্যময় একজন মেয়ে হয়ে আমার সামনে বসে আছেন। ভাবতেই দারুণ লাগছে।

বলেই, উঠে দাঁড়াল অভী। বলল, চলুন, আপনার ঘর দেখব।

বাবলি খুব খুশী হল। লজ্জাও পেল। আজ অবধি অন্য কেউ, অন্য কোনো পুরুষ, অভীর মতো পুরুষ বাবলি সম্বন্ধে এত উৎসাহ দেখায় নি।

ঘরে ঢুকেই বাবলি বলল, এই যে আমার মা-বাবার বিয়ের ছবি। মাকে আমি কখনও দেখি নি। ফটোতে ছাড়া।

অভী অনেকক্ষণ মনোযোগ সহকারে ছবিটি দেখল।

তারপর বলল, আপনার মুখ ঠিক আপনার মায়ের মতো।

বাবলি হাসল। বলল, হ্যাঁ, বাবা তাই বলেন।

পরক্ষণেই অভী থমকে দাঁড়াল অন্যদিকের দেওয়ালে তাকিয়ে।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ঐটি কার ছবি? কে?

বাবলি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল।

দেওয়ালে খুব বড় করে এনলার্জ করা বাবলির চার বছর বয়সের একটা ছবি।

ন্যাড়া-মাথা, ফোকলা-দাঁত ; ইজের আর নিমা পরে হাসছে।

এ ছবিটা যে এতদিন, এত বছর দেওয়ালের এ কোণায় টাঙানো ছিল, এতদিন এ-ঘরে থাকা সত্ত্বেও যে ছবিটাকে বাবলি কখনও আবিষ্কার করে নি, আজ অভীর চোখ দিয়ে তাকে, সেই ছোট্ট ন্যাড়ামুণ্ডি বাবলিকে হঠাৎ আবিষ্কার করে ও নিজেই ভীষণ লজ্জিত হল।

অভী খুব জোরে হেসে উঠল।

বলল, হাউ সুইট। কী দারুণ সুস্টুনি-মুস্টুনি ছিলেন আপনি ছোটবেলায়। রীতিমত কাড্লি। আদর করে দিতে ইচ্ছে করছে।

বাবলির কানের লতি দুটি লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

ও মুখ নামিয়ে নিল।

এ ঘরে অভীকে নিয়ে আসার জন্যে নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিল।

অভী ওর দিকে চেয়ে বলল, কি হল? আপনি এখনও দারুণ কাড্লি। এখনও নিশ্চয়ই অনেকেরই আপনাকে আদর করতে ইচ্ছা করে।

ঠিক এমন সময় কিষাণ সিং ওর নোংরা দুর্গন্ধ পায়জামা আর গেঞ্জিটা পরে একটা ছাল-ছাড়ানো মুরগীর গলা ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে বাবলির ঘরে ঢুকল। তারপর অভীর প্রতি বিন্দুমাত্র ইন্টারেস্ট না দেখিয়ে বাবলিকে শুধোল, পুরা বানায়গা?

রাগে বাবলির গা জ্বলে গেল।

কিষাণ সিংয়ের এত জামাকাপড় আছে কিন্তু সেসব বাইরে বেরোবার জন্যে। রান্না করার সময় ও মরে গেলেও পরিষ্কার জামা পরবে না।

বাবলি তাড়াতাড়ি বিরক্তির সঙ্গে বলল, হ্যাঁ। আভি যাও।

কিষাণ সিং চলে যেতেই, অভী বলল, আপনি এত আপসেট হয়ে পড়লেন কেন? নোংরা জামাকাপড় না হলে রান্নার স্বাদ ভালো হয় না। দিল্লির মেয়ে, আর জানেন না যে, যে-ফুচকাওয়ালা বা ভেলপুরিওয়ালার দাদ নেই, নোংরা গামছা নেই, তার কাছে কেউ যায় না, কেউ খায় না?

বাবলি মুখ সিঁটকাল। বলল, ঈ-স-স-স। আপনি ভীষণ খারাপ।

তারপর ওরা দুজনেই বারান্দায় এল।

অভী বলল, এখানে বসতে পারি? ভীষণ প্লেজেন্ট বারান্দাটা দারুণ দৃশ্য কিন্তু, না? এখান থেকে?

বাবলি বলল, হ্যাঁ। তারপর অভী বেতের চেয়ার টেনে বসবার পর বাবলি শুধোল, বাতি জ্বালিয়ে দেব?

অভী বলল, না। থাক, অন্ধকারই ভালো লাগছে।

রাস্তার লাইটপোস্টে লাগানো মার্কারী ভেপার ল্যাম্পটা থেকে একটা ফিকে নীলচে বেগুনে আলো এসে বারান্দায় পড়েছিল।

অভী বাইরের দিকে চেয়েছিল।

দূরে গাছপালা আর পোড়া পুরানো দুর্গ-টুর্গগুলোর ধ্বংসাবশেষগুলো আধো অন্ধকারে মাথা উঁচিয়েছিল।

বাবলিও বাইরে চেয়েছিল।

মাঝে মাঝে দু'জনে দুজনের দিকে মুখ ফেরাচ্ছিল, তারপর চোখাচোখি হতেই দু'জনেই মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। কেন যে, তা ওরা কেউ জানে না।

কেউই কোনো কথা বলছিল না এই মুহূর্তে অথচ একটু আগেই দু'জনেই কত প্রগলভ আলোচনা করেছিল, বলেছিল কত অর্থহীন ছেলেমানুষী কথা। এখন ওরা দু'জনেই বোবা হয়ে বসেছিল।

ওরা কতক্ষণ ওভাবে বসেছিল বাবলির মনে নেই।

অনেকক্ষণ পর অভী বলল, কি করবেন ঠিক করেছেন?

কিসের? বাবলি বলল।

জীবনের। চাকরিতে তো ঢুকলেন। এরপর কি প্ল্যান আপনার? কিছু কি ঠিক করেছেন?

বাবলি বলল, কিছুই ঠিক করি নি। চাকরিটাও যে করব, এমনও মনস্থির করি নি।

অভী অবাক হল। বলল, সে কি? আই-আর-এস হলেন, ট্রেনিং নিলেন, জয়েন করলেন আর চাকরি করবেন না কেন?

বলি নি তো করব না। বলেছি, করবোই যে, এমন এখনও ঠিক নেই।

তারপরই বলল, উইমেন্স লিব্ সম্বন্ধে আপনার কি মতামত? আপনি কি মনে করেন মেয়েরা স্বাবলম্বী হলে, নিজেরা আয় করলেই তাদের পক্ষে স্বাধীন থাকা সম্ভব? তাদের নিজেদের ইচ্ছা মতন চলাফেরা করা সম্ভব?

অভী অবাক হল। বলল, ও তো আপনার নিজস্ব মতামতের ব্যাপার। কোনো পুরুষের মতামতের ওপর কোনো মেয়ে তার স্বাধীনতার প্রকৃতি নিশ্চয়ই ঠিক করে না। তবে, উপার্জনের সঙ্গে কিছু স্বাধীনতা তো থাকেই। এ কথা অস্বীকার করার উপায় দেখি না।

বাবলি বলল, জানি না। আমি হয়তো সেকেলে। অথবা অন্যভাবে বললে বলতে হয়, আমি হয়তো ফুল অব কনট্রাডিকশানস। আমার কিন্তু মনে হয় যে, মেয়েদের স্বাধীনতাটা পার্কে অথবা রাস্তায় লড়াই করে বা মাসান্তে কিছু টাকা রোজগার করে

পাওয়ার নয়। কারণ সে ব্যাপারটা একটা সমষ্টিগত পাওয়া। কিন্তু জীবনে সমষ্টির দাম কতটুকু? বুঝতাম, মেয়েরা যদি বিয়ে না করত, অন্য অনেক দেশের মেয়েদের মতো জাস্ট লিভ-টুগেদার করত! আজ এর সঙ্গে, কাল ওর সঙ্গে—তারপর এমনি করে সঙ্গীর পর সঙ্গীর সঙ্গে—তাহলেও বুঝতাম। যারা সে জীবনে বিশ্বাস করে, আমি তাদের দলে নেই। আমি ছোটবেলা থেকেই ঘরের স্বপ্ন দেখেছিলাম। সুন্দর একটি থাকার জায়গা, এমন একজন স্বামী, যে সবদিক দিয়ে আমার চেয়ে ভালো, সবদিক দিয়ে বড় যাকে আমার সম্মান করতে একটুও দ্বিধা থাকবে না।

অভী বলে উঠেছিল, আর ছেলেমেয়ে?

বাবলিও সপ্রতিভতার সঙ্গে বলেছিল কমপক্ষে তিনটি ছেলেমেয়ে। ঘর ভর্তি কাজ। স্বামীর কাজ, বাচ্চাদের কাজ, এই নিয়েই আমি খুশী থাকব। এবং আমার স্বামীও আমার মধ্যে নিশ্চয়ই সম্মান করার মতো কিছু দেখবেন। আশা করি দেখবেন। তাহলেই আমি যে স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, সে-স্বাধীনতা পাবো বলে আমি মনে করি।

অভী অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

বাবলি হেসে বলল, কি আমার লম্বা বক্তৃতা শুনে কি আপনি ঘুমিয়ে পড়লেন?

অভী বলল, ঘুমিয়ে পড়ি নি। ভাবছি। আপনি তাহলে আপনার মনোমত ঘরের জন্যে মনোমত স্বামীর জন্যে এমন চাকরিটাও ছাড়তে রাজী? আশ্চর্য! আজকাল এমন দেখা যায় না, শোনা যায় না বড়।

বাবলি হাসল। বলল, হ্যাঁ। ভারত সরকারের চাকরির চেয়ে আমি আমার স্বামীর চাকরি করা অনেক ভালো বলে মনে করি। তারপরই বলল, আঁদ্রে মোরোয়ার লেখা একটা বই আছে, 'দ্য আর্ট অব লিভিং'। পড়েছেন!

অভী বলল, না।

যেখানে এক জায়গায় উনি বলছেন যে, ম্যাগনিচুড কোনো ব্যাপারই নয়। যে-কোনো পারফেক্ট জিনিসই পারফেক্ট। একজন গৃহিণী তার গৃহিণীপনায়, তার ভালোবাসায় তার সহনশীলতায় তার বুদ্ধিতে যদি তার ছোট্ট সংসারকে সুষ্ঠুভাবে চালিত করতে পারে, তবে তার কৃতিত্বের মধ্যে আর যে জননেতা কোনো বিরাট দেশের সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ কৃতিত্বের সঙ্গে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন, তার মধ্যে কৃতিত্বের মাত্রার কোনো তারতম্য নেই। দেশ চালানোর মতো ছোট্ট সংসার সুন্দরভাবে চালানোও একই রকম কৃতিত্ব। আমি সেই কৃতিত্বকে অনেক বড় বলে মনে করি। তবে জানি না, মনোমত ঘর, মনোমত স্বামী পাব কি না। মনোমত স্বামী না পেলে বিয়ে করাও হবে না, চাকরি ছাড়ার কথাও ওঠে না।

অভী হাসল। বলল, আপনার যোগ্য ছেলে কি ভারতবর্ষে আছে?

বাবলি হাসল। বলল, ঠাট্টা করছেন বুঝি?

অভী গম্ভীর গলায় বলল, ঠাট্টা করছি বলে মনে হল বুঝি আপনার?

বাবলি বলল, তাই-ই-ই তো। আমি কি, আমার যোগ্যতা কতটুকু, আমার রূপগুণের বাহার কতখানি, তা আমার নিজের তো অজানা নেই। আমি অত্যন্ত সাধারণ।

অভী বলল, নাঃ। আপনি তো রীতিমত ফ্যাসাদে ফেললেন। আপনার সঙ্গে আপনার যোগ্য কোনো ছেলের আলাপ করিয়ে দেওয়াটা দেখছি কর্তব্যে দাঁড়িয়ে গেল এখন। তারপরই একটু থেমে বলল, আলাপ করবেন? আমার এক বন্ধুর সঙ্গে? সে এখন দিল্লিতেই পোস্টেড। সে আপনার যোগ্য হলেও হতে পারে। আমার চেয়ে সে একশো গুণ ভালো, সব দিক দিয়ে। বলুন তো আলাপ করিয়ে দিই?

বাবলির খুব অপমানিত লাগল ওর নিজেকে। ছিঃ ছিঃ, ও কি নির্লজ্জের মতো অভীর কাছে নিজেকে নিবেদন করলো, আর অভী চালাকের মতো কথাটা এড়িয়ে গেল। ওর সঙ্গে আলাপ করাতে চাইলো অন্য কারো?

বাবলি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

তারপর কেটে কেটে বলল, না। ধন্যবাদ। আমার জন্যে আপনার এত কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। আমি নাবালিকা নই। আমার স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারে আপনার সহায়তা না হলেও চলবে।

অভী চমকে মুখ তুলে তাকাল। তারপর লজ্জিত গলায় বলল, আই য়্যাম সরি। আমি কথাটা কিন্তু সিরিয়াসলি বলেছিলাম। আন্তরিকভাবেই। আপনাকে কোনোভাবে আঘাত করতে চাই নি।

বাবলি হেসে ব্যাপারটা লঘু করে দিয়ে বলল, আঘাত আমার এত সহজে লাগে না। ছোটবেলায় মা-হারানো মেয়ে। ছোটবেলা থেকে অনেক আঘাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

কিছুক্ষণ পর, অভী কোনো কথা বলছে না দেখে বাবলি কথা অন্যদিকে ঘুরোবার জন্যে বলল, তাহলে পরশু রাতে খেতে আসছেন তো? কি কি খেতে ভালবাসেন আপনি? এখানে তো ডিমাপুরের রসিদ আলি নেই। তবে, যদি বলেন কি খেতে ভালোবাসেন তাহলে আমি নিজে রান্না করবো। অফিস তো ভুল করে ছুটিই নিয়ে ফেলেছি। যখন ছুটি নিই, তখন বুঝতে পারি নি যে আমার আপনার জন্যে যতখানি ভাবনা, আপনার তা নেই আমার জন্যে। ব্যাপারটা ছেলেমানুষী হয়ে গেছে। যাই-ই হোক অন্তত সারাদিন রান্না করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যাব। এখন বলুন

দয়া করে, কি খেতে ভালোবাসেন?

অভী এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ বাবলির মুখের দিকে চেয়ে রইলো। আস্তে আস্তে একটা আলতো হাসি ওর মুখময় ছড়িয়ে পড়ল। বিস্ময়ের হাসি। যে হাসি ওর পক্ষে লুকানো সম্ভব ছিল না।

তারপর বলল, ভালো করে শুনুন কি কি খেতে ভালবাসি। নারকোল দিয়ে মুগের ডাল, ঝিঙে-পোস্ত, তেল-কই ধনেপাতা দিয়ে, আর আর আর—তারপর ভেবে বলল, আনারসের চাট্‌নি।

বাবলি বলল, ব্যস্‌স। আর কিছুই ভালোবাসেন না?

অভী বলল, ভালো অনেক কিছু বাসি। কিন্তু এই-ই যদি খাওয়ান তা হলেই ভীষণ খুশী হব। আসল ব্যাপারটা কি জানেন? চিরদিন বাইরে বাইরে একা একা থাকা, চাকর-বাকরের দয়ায় খাওয়া-পরা। আসলে যা ভালোবাসি, তা হচ্ছে খাওয়ার সময় কেউ সামনে বসে থাকুক, আমার সঙ্গে বসে খাক—তারপরে গল্প করতে করতে খাই—একজন কেউ থাকুক যে এটা-ওটা এগিয়ে দিতে পারে-নুনটা, সস্‌টা—ব্যস্‌স—এতেই খুশী। আপনি আমার খাওয়ার সময় আমার সামনে বসে থাকবেন তো?

বাবলির বুকের মধ্যে কি যেন কি একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠল। বাবলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল, নিশ্চয়ই বসব। তারপর বল, ইম্ফলে আপনার খাওয়া-দাওয়ার খুব অযত্ন হয় না?

অভী বলল, না না অযত্ন হবে কেন। আমার কাছে যে ছেলেটি আছে, সে চমৎকার। খুব আদর-যত্ন করে। তবু কোথায় যেন কি একটা বাকি থাকে। কি যেন নেই, কি যেন নেই মনে হয়। আপনাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না।

বাবলি বলল, না বললেও বুঝতে পারি।

অভী বলল, ইম্ফলে আর একবার চলে আসুন আপনি। সেবার এত অল্পদিন থাকলেন যে কিছুই তো দেখা হয় নি আপনার। তারপর আপনার সঙ্গে আলাপ হল একেবারে চলে আসার সময়—এসকর্ট হিসাবে। এবারে এলে বন্ধুত্বের দাবিতে আপনাকে যা যা দেখাবার আছে সব ঘুরিয়ে দেখাব। আমার বাংলোয় নিয়ে যাব। আসবেন?

বাবলি ক্যাজুয়ালি বলল, পুজোর সময় কি কলকাতা যাবেন?

অভী বলল, না। কলকাতা গিয়ে কি হবে? এবারেই মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মা তো এখন থেকে দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গেই থাকবেন বম্বেতে। আর কলকাতার আকর্ষণ যে বন্ধুরা—তারা তো সকলেই সারা পৃথিবীতে এবং

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। কলকাতার এখন আর কোনোই আকর্ষণ নেই আমার কাছে। ইম্ফলেই থাকব।

কি করবেন ছুটিতে একা একা? বাবলি শুধোল।

খাব, একটু লেখাপড়া করব নিজের সখের। টেনিস্ খেলব। আর ঘুমব।

হঠাৎ বাবলি বলল, আমি যদি পুজোর সময় যাই?

অভী আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল। বলল, আসবেন? আসুন না। তাহলে তো গ্র্যান্ড হয়। আমারও ছুটি থাকবে। আপনাকে সবসময় কম্প্যানি দিতে পারব।

বাবলি বলল, কিন্তু পুজোর সময় মাসীমা-মেসোমশায় বোধহয় কলকাতা আসবেন। আমি তাহলে কোথায় থাকব? ভালো হোটেল আছে ইম্ফলে।

আছে, আছে। অভী বলল। হোটেল-দ্য-অভী। আমার হোটেলে থাকবেন। ফাইভ-স্টার হোটেল নয়। থাকতে কষ্ট হবে আপনার কিন্তু শোওয়ার ঘর, অ্যাটাচ বাথ এবং অন্যান্য সমস্ত সুবিধা পাবেন, প্লাস ট্যুরিস্ট গাইড পর্যন্ত। আসবেন তো?

তারপর বলল, আমি ভাবতেই পারছি না যে, আপনি সত্যি সত্যিই আসবেন। পুজোর তো বেশি দেরিও নেই। আর মাস দেড়েক। আমি তা হলে ফিরে গিয়েই আমার গাড়িটা একেবারে ঠিক-ঠাক করে ফেলব। খুব মজা হবে। প্লিজ আসুন।

বাবলি বলল, কথা দিতে পারছি না, তবে চেষ্টা করব। খুব চেষ্টা করব।

একটু পরে বাবলি বলল, একটা কথা বলবো আপনাকে?

আচ্ছা, ডিমাপুরের রাস্তায় আপনি যখন আপনার গাড়ির পিছনে আব্রাকাডাব্রা বলে আমার কথামতন লাথি মেরেছিলেন তখন সত্যিই কি আপনি ভেবেছিলেন যে ঐ মন্ত্রে গাড়ি চলবে? আপনি কি ওসবে বিশ্বাস করেন?

অভী হো হো করে হেসে উঠল।

বলল, ভালোই হল আপনিই কথাটা তুললেন বলে। দেখুন আপনি ইম্ফল থেকে বেরোনোর পর থেকেই আপনার কথাবার্তায় বুঝেছিলাম যে আপনি ভীষণ বুদ্ধিমতী। এও বুঝেছিলাম যে আপনার এই বুদ্ধিমত্তার জন্যে স্বাভাবিক কারণে আপনি গর্বিত। আমাকে বোকা বানিয়েও আপনি এক রকমের নিষ্ঠুর আনন্দ পাচ্ছিলেন। একথা যখন বুঝেইছিলাম, তখন কেন আর আপনার আনন্দ থেকে আপনাকে বিনা কারণে বঞ্চিত করি আমি? তা-ই যা যা বলেছিলেন, যখনই বলেছিলেন তা-ই-ই করে আপনাকে খুশিমনে রাখার চেষ্টা করেছিলাম। অন্যায় করেছিলাম কি?

বাবলির মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল।

বাবলি হাসির মতো শিস্ তুলে বলল, ঈ-স্-স্ আপনি কি খারাপ? আপনি জেনে

শুনে অমন বোকা সেজে ছিলেন? কি ডেঞ্জারাস লোক আপনি বাবা!

হঠাৎ ঘড়ি দেখল অভী। বলল, ওরে বাবাঃ অনেক রাত হয়ে গেল—আমার বৌদি হাতে মাথা কাটবেন আমার। এবার কিন্তু উঠি, কেমন?

বাবলি বলল, যা ইচ্ছে।

অভী উঠতে উঠতে বলল, আমার যা ইচ্ছে। আপনার কোনো ইচ্ছে নেই?

বাবলি বলল, না। ইচ্ছা পূরণ না হলে সে ইচ্ছা থেকেই বা লাভ কি?

অভী ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল বাবলির দিকে। এক আশ্চর্য ভালোলাগা ও কৌতুকমেশানো হাসিতে ওর মুখ আবার ভরে উঠল। হঠাৎ অভী ডান হাতটা বাড়িয়ে বাবলির ডান হাতের পাতাটা ধরে ফেলল। তারপর বাবলির হাতটা ওর মুখের কাছে তুলে নিয়ে ওর ঠোঁট ছোঁওয়ালো বাবলির হাতে। বলল, কেন জানি না আপনাকে আমার খুব ভালো লেগে গেছে।

তারপরই হঠাৎ বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন।

বাবলি মুখ নামিয়ে ছিল। বাবলির কানের লতি আনন্দে ভালোলাগায় লাল ও গরম হয়ে উঠেছিল।

বাবলি মুখ নামিয়েই রইল।

অভী ক্ষমা চাওয়ার গলায় বলল, আপনি রাগ করলেন?

না। বাবলি বলল।

অভী বাবলির একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ওর চোখের গভীরে কি যেন খোঁজার চেষ্টা করতে লাগল। পরক্ষণেই অভী নীচু হয়ে বাবলির চোখের পাতায় চুমু খেল।

বাবলি একমুহূর্ত অভীর বুকের ওপর মুখটা নুইয়ে রাখল। পরমুহূর্তে ও ছিটকে সরে এল। ওর মনে হল ওর সারা শরীরে কি এক আগুন জ্বলে উঠেছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে। যে আগুনের নাম জানে না ও।

বাবলি জানল না সেই মুহূর্তে যে এই আগুন আর কখনও নিভবে না। তুষের আগুনের মতো নিঃশব্দে ধিকিধিকি করে জ্বলবে। বাবলির শরীরের সমস্ত অণুপরমাণুতে। বাবলির মনের মলিকিউলে।

ছয়

কাকা-কাকীমার ফিরতে সত্যিই দেরি হচ্ছিল। তবু কাল অফিস নেই বলে বাবলি সাড়ে এগারোটা অবধি দেখল। তারপর খেতে বসল। একা একা।

খাওয়ার পর কিষাণ সিংকে দিয়ে কাকা-কাকীমার খাবার-টাবার ঠিক করে রাখিয়ে, জলের জাগ, গ্লাস, প্লেট, চামচ ইত্যাদি সব সাজিয়ে ও ঘরে গেল।

ঘরের দরজা সবে বন্ধ করেছে এমন সময় টেলিফোনটা বাজল।

বাবলি উঠে গিয়ে টেলিফোনটা ধরল।

কাকার ফোন। কাকার গলা খুব ভারী শোনাল। কাকা শুধু দুটো কথা বললেন। বিমানবাবু মারা গেলেন রে বাবলি। আমাদের আসতে একটু দেরি হবে। তুই শুয়ে পড়িস। আজ আর খাব না আমরা।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

বিমানবাবু ও তাঁর মোটাসোটা হাসিখুশি স্ত্রীকে দু-একদিন দেখেছে বাবলি ওদের বাড়িতে। বিমানবাবু খুব দরাজ হাসি হাসতেন। হঠাৎ কার যে কি হয়। মানুষের জীবনের কিছুই ঠিক নেই।

বাবলি তখনো ঘরে ঢোকে নি, বসবার ঘরে একটা জানালা খোলা ছিল, কিষাণ সিং বুঝি বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। বাবলি জানালাটাকে বন্ধ করছে এমন সময় ফোনটা আবার বাজল। বাবলি ওয়াল-ক্লকে চেয়ে দেখল, সাড়ে এগারোটা বাজে রাত।

ফোনে একবার খারাপ খবর এলে পরের বার ফোন বাজলে ফোন ধরতে ইচ্ছে করে না। কারুরই করে না। বুকের মধ্যে দুরদুর করে। তখন অন্য কেউ হাতের কাছে থাকলে তাকেই ফোন ধরতে বলতো ও। কিন্তু কেউই নেই এখন। বাবলি ভীরু পায়ে এগিয়ে ভয়ে ভয়ে রিসিভারটা তুললো। তারপর যেন কোনো খারাপ খবর আর ও শুনতে রাজী নয়, এমনভাবে প্রতিবাদের গলায়, বিরক্তির গলায় বলল, হ্যালো।

ওদিক থেকে কাঁপা ভয়ার্ত গলায় কে যেন বলল, হ্যালো, আপনি কে?

বাবলি ভয় পেল। কোনো বাজে লোক নয়তো? হয়তো জেনে গেছে, বাবলি একা আছে বাড়িতে।

সেই রাতের রহস্যময় চাপা দ্বিধাগ্রস্ত স্বর আবার বলল, বাবলি আছেন?

বাবলি রুক্ষ গলায় বলল, আপনি কে?

আবার সেই স্বর বলল, আপনি বাবলি?

হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ, যেভাবে হঠাৎ কোনো ইলেকট্রিক ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যায়, তেমন করে সেই ভয়টা বাবলিকে ছেড়ে চলে গেল। তার বদলে একটা আলোজ্বলা খুশির ট্রেন বাবলির মনের প্ল্যাটফর্মে এসে ঢুকল।

বাবলি একটু থেমে বলল, আপনি কে? অভী?

—হ্যাঁ, আমি। রাগ করলেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলেন আপনি?

—না। বাবলি বলল। তারপরেই বলল, আপনি কি করছিলেন?

—শুয়ে ছিলাম।

—ঘুমোন নি কেন এত রাত পর্যন্ত?

—ঘুম আসছিল না। কিছুতেই ঘুম আসছিল না।

বাবলি হাসলো। বলল, আমি কি আপনার ঘুমের ওষুধ? আমি কি স্লিপিং পিল?

লজ্জিত গলায় ওপাশ থেকে অভী বলল, জানি না।

বাবলি বলল, অমন চোরের মতো গলায় কথা বলছেন কেন?

অভী আরো লজ্জা পেল। বলল, সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। দাদা বৌদির ঘরের পাশেই ফোনটা। শুনতে পেলে?

—শুনতে পেলে কি? বাবলি হেসে শুধোল।

বাবলির জীবনে বাবলি এই-ই প্রথম জানলো ওর কতখানি দাম, কত ইমপর্টান্ট ও অন্য একজনের চোখে। জেনে ভালো লাগল যে, সে ঘুমপাড়ানি মাসী-পিসী হয়ে আরেকজনের চোখে গিয়ে উড়ে না বসলে একজনের ঘুম আসে না।

অভী বলল, নাঃ, রাত বারোটার সময়! তা-ই।

বাবলি বলল, তাহলে ঘুমিয়ে পড়ুন।

অভী একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, কাল দেখা করতে চাই। কাল কখন অফিস ছুটি আপনার?

—বললাম না ছুটি নিয়েছি অফিস।

ধমকের সুরে বাবলি বলল।

বাবলির একথা ভেবে ভালো লাগল যে, তার এতদিনে একজন ধমক দেওয়ার লোক হল। সে মুখ নীচু করে ভালোলাগার সঙ্গে তার ধমক শুনবে।

অভী বলল, ইউনিভার্সিটিতে আমার কাজ চারটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। আপনি সাড়ে চারটেয় আসুন।

—কোথায়? বাবলি বলল।

কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজের রেস্তোরাঁয়। আমি থাকব। কনট্ সার্কাসে।

বাবলি বলল, আসব।

অভী বলল, ছাড়ি?

বাবলি বলল, ঘুমিয়ে পড়ুন লক্ষ্মীছেলের মতো কেমন?

অভী হাসল। বলল, লক্ষ্মীমেয়ের মতো আপনিও।

বাবলি হাসল। বলল, তাই-ই।

—ছাড়ুন। অভী বলল।

—না। আপনি আগে ছাড়ুন।

অভী ফোন ছেড়ে দিল।

তারপর বাবলিও ছাড়ল।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে অনেকক্ষণ বসে রইল বাবলি। শাড়িটাড়ি ছেড়ে হাল্কা সুতীর নাইটিটা পরল। মুখে ক্রীম লাগাল। ঘাড়ে, গলায় বুকে এবং সমস্ত শরীরে পাউডার মাখল। গলার কাছে ফ্রিল দেওয়া ও লেস বসান হাল্কা গোলাপী রঙা নাইটিটাতে ও নিজেকে খুব সুন্দরী দেখে। আয়নার সামনে বসে ও আয়নাকে উদ্দেশ্য করে বলল, একদিন শুধু তুমিই আমাকে এই রুদ্ধ ঘরের মধ্যে নাইটিতে দেখেছ। দিন আসছে, যেদিন তুমি ছাড়াও আর একজন আমাকে দেখবে। সেদিন তোমার সামনে বসে একা একা এমন করে তোমার সঙ্গে কথা বলার অবসর আমার হবে না। বুঝেছ আয়না? তখন একজনের দুটি মুগ্ধ চোখের সামনে আমায় বসে থাকতে হবে—অনেকক্ষণ অনর্গল আগল দেওয়া ঘরে বসে আমায় কথা বলতে হবে তার সঙ্গে। সেদিন তুমি কি হিংসা করবে তাকে? সেই অন্যজনকে? কি আয়না। করবে হিংসা?

বিছানায় গিয়ে শুল বটে। কিন্তু ঘুম এল না বাবলির। কিছুতেই ঘুম এল না। অভীর ঘুম না-আসা রোগটা টেলিফোনের তার বেয়ে এসে বাবলিকে কোনো অদৃশ্য ভাইরাস ইনফেকশনের মতো পেয়ে বসল।

এপাশ ওপাশ করল। পাখাটাকে আরো জোর করল। বারান্দার দিকের জানলা খুলে দিল। এক সময় নাইটিটাও খুলে ফেলল। শুধু প্যান্টি পরে শুয়ে রইল। তবুও ঘুম এল না বাবলির। বাবলির সব ঘুম কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে। বাবলির সমস্ত হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও।

পরদিন দুপুরের খাওয়ার পর বাবলি শুয়েছিল। কাকীমাও ঘুমোচ্ছিলেন নিজের ঘরে—সারারাত ঘুমোন নি কাকীমা। বাবলি যখন শেষ রাতে ঘুমিয়েছিল ভোর হওয়ার আগে ঠিক তখনই কাকা-কাকীমা বাড়ি ফিরেছিলেন। বাবলি জানতে পারে নি। কাকীমার মুখে সেই এক কথা। বিমানবাবুর স্ত্রীর বিলাপ। ছেলেমেয়েদের কান্নাকাটির কথা।

বাবলির ভালো লাগছিল না ওসব কথা শুনতে। ও মনে মনে যখন এক দারুণ আনন্দময় অবস্থার মধ্যে অবস্থান করছিল সেই সময় কারও করুণ দুঃখের কাহিনী, তার শোকাবহতা; এসব কিছুই বাবলি শুনতে রাজী ছিল না। তাছাড়া আশ্চর্য! বাবলি নিজেও ভেবে অবাক হল যে, কাকীমার এই মন খারাপ, বিমানবাবুর মৃত্যুর এই শোক তার মনকে একেবারে স্পর্শমাত্র করল না। সেই মুহূর্তে ওর বিশ্বাস করতে

কষ্ট হচ্ছিল যে, পৃথিবীতে মৃত্যু আছে, শোক আছে, কাউকে হারাবার বিয়োগব্যথা আছে। ওর সমস্ত মনে আনন্দ, সমস্ত রকম আনন্দের যোগফল তখন ওর পায়ের রুপোর পায়জোরের মতো চলতে ফিরতে ঝুমঝুম করে বাজছিল।

ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে উঠে বাবলি বাথরুম থেকে ঘুরে এল মুখ-টুখ ধুয়ে। ভালো করে চুলটা বাঁধল। আজ চান করার সময় শ্যাম্পু করেছিল ও। চুল বাঁধল, আইব্রো পেন্সিল বোলাল ভুরুতে—তারপর সাদা জমির ওপর কালো ছাপার কাজের একটা অর্গান্ডী শাড়ি বের করল আলমারি থেকে। সঙ্গে কালো সিল্কের ব্লাউজ, কালো ব্রেসিয়ার, ছাইরঙা সায়া। কালো পাথরের একটা তিব্বতী মালা বের করল ড্রয়ার থেকে। তারপর কালো একটা হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে ঠিক পৌনে চারটার সময় বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

দিল্লিতে এ সময়টা ভীষণ গরম পড়ে। বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই ঘেমে উঠল বাবলি। ট্যাকসিই নিত একটা কিন্তু ট্যাকসিস্ট্যান্ডে ট্যাকসি ছিল না।

কনট্ সার্কাসে গিয়ে ও যখন নামলো, তখন চারটে বেজে কুড়ি। বাসে একেবারে ঘেমে উঠল বাবলি। ভীষণ রাগ হচ্ছিল ওর। কটেজ ইন্ডাস্ট্রীর রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসে একটা কোকা-কোলার অর্ডার দিল বাবলি। পাখার নীচের টেবিল বেছে নিয়ে বসল ও। কামনা করছিল যে, অভী একটু দেরি করে আসুক। ওর ঘামটা ততক্ষণে শুকিয়ে যাক। ও চায় না যে, অভী ওকে এমন ভূতের মতো দেখুক।

কোকা-কোলাটা খাওয়ার পর দেখল ঘড়িতে প্রায় সাড়ে চারটে বাজে। ততক্ষণ ওর ঘাম শুকিয়ে গেছে। তবুও একবার উঠে গিয়ে কটেজ ইন্ডাস্ট্রীর এম্পোরিয়ামের ভেতর ঢুকে লেডিজ রুমে গিয়ে ভুরুটা ঠিক করে নিল। ঠোঁটটা গরম হাওয়ায় শুকিয়ে গিয়েছিল। পাতলা করে ভেসলিন বুলিয়ে নিল একটু। তারপর রেস্তোরাঁতে ফিরে এলো। তখনও অভী আসে নি।

অভী এল চারটে চল্লিশে। একটা সাদা রঙের ট্রাউজার আর তার ওপরে খয়েরীরঙা ফ্রেড-পেরী গেঞ্জী পরে অভী রেস্তোরাঁর মুখে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিকে চেয়ে বাবলিকে খোঁজার চেষ্টা করছিল।

ওর গেঞ্জীর বোতামগুলো সব খোলা ছিল। কপালে চুল লেপ্টে ছিল ঘামে। লম্বা সুগঠিত শরীরের অভীকে অনেক অনেক সুন্দর স্মার্ট পাঞ্জাবী ছেলেদের পটভূমিতেও স্ট্রাইকিংলি হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছিল। বাবলি অবাক হল ভেবে যে,—ইম্ফল থেকে ডিমাপুর আসার পথে অভীর এই পুরুষালী সৌন্দর্য কেন একবারও ওর চোখে পড়ে নি? কে জানে? ভাবল বাবলি, ওর চোখ দুটোই হয়তো এখন বদলে গেছে। অভী হয়তো আগের মতই আছে।

বাবলি উঠে দাঁড়াল, উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল অভীকে।

অভী হাসল। হেসে কাছে এল। তারপর চেয়ার টেনে বাবলির সামনে বসে পড়েই বলল, এ জায়গাটা বেশ স্টাফী—যদিও সামনেটা খোলা। চলুন, কিছু খেয়ে, বাইরে বেরিয়ে পড়ি।

বাবলি বলল, যা বলবেন।

তারপর বলল, আমারও এ জায়গাটা ভালো লাগে না। সব সময় লোক গিজ্ গিজ্ করে—কনুইয়ে কনুইয়ে ঠেকে যায়।

অভী বলল, কি খাবেন বলুন?

বাবলি বলল, আমি খাওয়াব কিন্তু।

একটু থেমে বাবলি বলল, দহি-কচুরি খাবো আমি। আপনি?

অভী বলল, আমি কিছুই খাব না, শুধু চা।

—না, তাহলে হবে না। আপনারও কিছু খেতে হবে।

অভী ওর বলার ধরন দেখে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, আপনি এখনও বাচ্চা মেয়ে আছেন। বলে ফেলুন, না খেলে খেলব না।

বাবলি লজ্জা পেল। বলল, আ-হাঃ, আমি মোটেই বাচ্চা নেই। বলুন কি খাবেন?

অভী বলল, তাহলে একটা দোসা খাব। প্লেন দোসা।

বাবলি বেয়ারাকে ডেকে খাবার অর্ডার দিল। তারপর অভীর দিকে ফিরে বলল, কি? শেষ পর্যন্ত ঘুম হয়েছিল?

অভী লজ্জা পেল। রাতে কেন সে এমন ছেলেমানুষী করেছিল, তা ভেবেই ওর লজ্জা লাগছে। ও বলল, না। বৌদি পোলাও-মাংস রান্না করেছিলেন ; তাই বোধহয় খেয়ে পেট গরম হয়ে থাকবে।

বাবলিও কথা ঘুরিয়ে বলল, এখন ভালো আছেন?

অভী বলল, হ্যাঁ। ভালো। আপনাকে দেখেই হয়ে গেলাম।

বাবলি কপট রাগ দেখিয়ে বলল, ইস্-স্, বানিয়ে বানিয়ে বলতে হবে না।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে বিল মিটিয়ে ওরা যখন জনপথ ধরে হেঁটে যেতে লাগল পাশাপাশি, তখন রোদের তেজ একটু কমেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হতে তখনও অনেক দেরি। সাতটার আগে দিল্লিতে সন্ধ্যে হয় না গরমের দিনে। পথঘাট সব তেতে রয়েছে। একটা গরম ঝাঁঝ উঠছে চতুর্দিক থেকে।

ওরা ধীরে ধীরে তিব্বতী রিফিউজীদের দোকানগুলোর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাবলি বলল, দাঁড়ান, আপনাকে দুটো কাফ-লিংকস্ কিনে দিই।

অভী আপত্তি করল না।

বাবলি বেছে বেছে একজোড়া কাফ-লিংকস্ কিনে দিল।

ওরা ইম্পিরিয়াল হোটেল ছাড়িয়ে, ওয়েস্টার্ন কোর্ট ছাড়িয়ে জনপথ হোটেলের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল।

অভী হঠাৎ বলল, কাউকে কিছু দিতে আপনি খুব ভালোবাসেন, না?

বাবলি মুখ ঘুরিয়ে অভীর দিকে তাকাল।

বলল, সকলকে না। কাউকে—কাউকে।

পরেই বলল, আপনি ভালোবাসেন না দিতে?

অভী বলল, মাকে, দিদিকে দাদা-বৌদিকে দিতে ভালো লাগে। বন্ধুদেরও। তবে বাইরের লোককে কখনও কিছু দিই নি।

'বাইরের লোক' কথাটা বাবলির কানে লাগল। একটু গম্ভীর হয়ে বলল, হ্যাঁ, বাইরের লোকদের কিছু দেবেন না। মিছিমিছি অপচয় করবেন কেন?

অভী হাসল। বলল, কথাটা আপনি বুঝলেন না। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, দেবার মতো কোনো সম্পর্ক মা-দিদি-দাদা-বৌদি ছাড়া এখনও কোনো মানুষের সঙ্গে তেমনভাবে পাতানো হয় নি। হবে হয়তো। হয়তো শীগ্‌গিরই হবে।

বলেই, বাবলির মুখের দিকে তাকাল।

কেন জানে না, দিল্লি জায়গাটা অভীর দারুণ লাগে। শুধু খারাপ লাগে এক কারণে যে পুরো ভারতবর্ষের, বিশেষ করে কলকাতার দারিদ্র্য, নোংরা, ভিড়, অসুবিধা, কষ্ট এসব দেখে এসে দিল্লি যে ভারতবর্ষেরই রাজধানী, একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কনট্ সার্কাসের রঙীন ফোয়ারার খরচে অনেক হাসপাতাল, অনেক বেশি প্রয়োজনীয় জিনিস বানানো যেত হয়তো। তাই এই অসাম্যটা বড় চোখে লাগে।

এছাড়া দিল্লির কোনো খুঁত নেই। বিশেষভাবে নতুন দিল্লির চওড়া চওড়া পথঘাট, চমৎকার আবহাওয়া। হাঁটতে, বেড়াতে খুব ভালা লাগে অভীর এখানে।

ওরা কোটার মহারাজার বাড়িটা বাঁদিকে রেখে এম পি-দের বাংলোগুলো ডানদিকে রেখে হাঁটতে লাগল। বড় বড় গাছ ছায়া ফেলেছে পথে। গাড়ি, সাইকেল সব ছুটে চলেছে অফিস ছুটির পর। ওরা দুজনে নানারকম কথা বলতে বলতে হেঁটে চলেছে তো হেঁটে চলেইছে। যেসব কথার মানে নেই কোনো। মিরান্ডা হাউসের গল্প। এ গল্প, সে গল্প। অফিসের গল্প।

অভী কথা বেশি বলছে না। শুনছে বেশি। বাবলিই বক্‌বক্ করছে।

ওরা একটা পথ পেরোবে, এমন সময় একটা টোয়োটা গাড়ি, সাদা-রঙা, দাঁড়িয়ে পড়লো ওদের দেখে, পথের বাঁপাশে থামল। অভী দেখল, স্টিয়ারিং-এ বসা, একটি পাঞ্জাবী মেয়ে হাত নাড়িয়ে বাবলিকে ডাকছে।

বাবলি হাত নাড়িয়ে ওকে হাত দিয়ে এগিয়ে যেতে ইশারা করে বলল, থ্যাংকু য়্যু অনীতা, থ্যাংকু য়্যু। উই আর এনজিয়িং দ্য ওয়াক। থ্যাংকু য়ু ভেরী মাচ।

অভী শুধাল না কিছু।

একটু পরে বাবলি নিজেই বলল, আমার বন্ধু অনীতা সাবারওয়াল। আমার সঙ্গে মিরান্ডা হাউসে পড়ত। এখানে বাটিকের দোকান করেছে একটা। খুব ভালো ব্যবসা। ওর স্বামীর কি সব কারখানা-টারখানা আছে ফরিদাবাদে। ভদ্রলোক এঞ্জিনীয়র।

অভী বলল, তাই বুঝি?

অনীতার কথা উঠতেই বাবলি হঠাৎ বলল, আচ্ছা আপনি ঝুমাকে চেনেন? ঝুমা সেন। এয়ার হোস্টেস। ওকে একবার দেখলে ভোলবার কথা নয়। দারুণ সুন্দরী।

বলেই, একঝলক দেখে নিলো অভীর চোখে।

অভীর মুখে কোনো ভাবান্তর হল না।

হল না দেখে, বাবলি খুশি হল।

অভী বলল, নাম তো মনে নেই। একজন এয়ার হোস্টেসের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, বাঙালি ; কলকাতার ক্লাবে সাঁতার কাটতে গিয়ে। হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে, বেশ ভালোই দেখতে। তবে মনে করে রাখার মতো কিছু বলে তো মনে হয় নি।

তারপর বলল, আসলে শুধুই চেহারাটা বোধহয় কোনো ব্যাপার নয়। আমার চোখে বোধহয় খুব সুন্দরী হলেই কাউকে অ্যাট্রাকটিভ ঠেকে না। হয়তো এই আমার দোষ, কিংবা গুণ ; জানি না।

বাবলি বলল, ঝুমাও আমাদের সঙ্গে পড়ত। এবার আসবার সময় দমদম এয়ারপোর্টে দেখা হল ওর সঙ্গে। ও কিন্তু আপনার সম্বন্ধে না-বলেই, চোখ বড় বড় করে ভুরু নাচিয়ে বলল, যাকে বলে একেবারে—কি বলবো—হেড ওভার হিল্স। আপনার স্যুইমিং কস্ট্যুম পরা ছবি হ্যান্ডব্যাগে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝুমা। এ খবর কি আপনি রাখেন?

কথাটা বলে ফেলেই বাবলি বুঝতে পারল যে ভুল করেছে ও। বাবলি ভাবল, অভী বাবলির চোখে একটা অপ্রত্যাশিত ঈর্ষার আগুন নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে।

নিজেকে অভিশাপ দিতে লাগল বাবলি কথাটা মুখ ফুটে বলার জন্যে।

অভী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আশ্চর্য।

তারপর বলল, ইটস্ ভেরী কাইন্ড অফ হার। তবে, আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ নিতান্তই ফর্ম্যাল আলাপ।

বাবলি কথাটার মোড় ফেরাবার জন্যে বলল, ও আমার সঙ্গে পড়তো তো, তা-ই।

অভী ইন্‌ডিফারেন্ট গলায় যেন অনেক দূর থেকে বলছে, এমনভাবে বলল, আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু?

বাবলি সতর্ক হয়ে গেল। কি জবাব দেবে ভেবে পেল না।

বলল, যখন একসঙ্গে কলেজে পড়তাম, তখন ঘনিষ্ঠতা নিশ্চয়ই ছিল। এখন অবশ্য দেখা-সাক্ষাৎ নেই।

অভী হঠাৎ বলল, উনি কি ইম্ফলের ফ্লাইটে যান কখনও?

বাবলি মিথ্যা কথা বলল। বলল, জানি না।

বাবলির গলাটা এমন শোনাল যে, ও যে শুধু জানে না, তা-ই নয়, জানতে চায়ও না।

অভী বলল, আমি যেদিন ইম্ফল থেকে আসি, তার আগের দিন অফিসে একজন এয়ার হোস্টেস আই এ সি-র অফিস থেকে ফোন করেছিলেন। আমি অফিসে ছিলাম না তখন, আমার টেবলে মেসেজটা লেখা ছিল। তখন মনে হয়েছিল, অপারেটর ভুল মেসেজ নিয়েছে। কারণ আমি মোটেই স্যুইমিং ক্লাবে দেখা আপনার বান্ধবী যে ইম্ফলে এসেছেন, এ ব্যাপারটা কানেক্ট করতে পারি নি তখন। এখন তো মনে হচ্ছে, মিস সেন তাহলে উনিই হবেন হয়তো।

বাবলির খুব রাগ হল মনে মনে। ঝুমার এই গায়ে-পড়া জোর করে ভালোবাসা স্বভাব দেখে ঘেন্নাও হল। কিন্তু দোষটা বাবলির। কেন এই প্রসঙ্গ ও তুলতে গেল?

পরক্ষণেই অভী বলল, অত্যন্ত স্বল্পপরিচিত একজন ভদ্রলোককে এমনভাবে ফোন করে দেখা করতে বলাটা বেশ ব্যাড টেস্ট কি বলুন? তবে আমার মনে হয়, উনি নিশ্চয়ই আমার পিসতুতো দাদার কাছ থেকে কোনো জিনিস নিয়ে এসেছিলেন—অথবা কোনো খবর দেওয়ার ছিল—নইলে কেনই বা ফোন করবেন? কোনো কাজ না থাকলে কি কেউ এমনভাবে ফোন করতে পারেন?

বাবলি বলে উঠল, মেসেজ দেওয়ার থাকলে তো ফোনেই দিতে পারত। পারত না?

অভী যেন একথাটা জানত না, এমনভাবে বলল, ও হ্যাঁ। তা-ই-ই তো। এ কথাটা মনে হওয়া উচিত ছিল আমার।

এরপরই অভী যেন কি রকম গম্ভীর হয়ে গেল।

বাবলির মনে হতে লাগল, ঝুমার প্রসঙ্গ উঠতেই অভীর এই পরিবর্তন। তবে কি ঝুমা ইতিমধ্যে অভীর সঙ্গে দেখাও করেছে? বাবলি যে ঝুমাকে ঈর্ষা করে এ-কথাটা যে আর অভীর কাছে গোপন রইল না এটা বুঝতে পেরেই বাবলির ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল। অভীর সঙ্গ ওর আর একটুও ভালো লাগছিল না যেন। ওর

মনে হতে লাগল, ও যেন পালাতে পারলে বাঁচে।

একটু পরে বাবলি বলল, এবার কিন্তু আমাকে বাড়ি যেতে হবে।

বাবলি ভেবেছিল, অভী বলবে, সে কি? এত তাড়াতাড়ি কিসের?

কিন্তু অভী বলল, হ্যাঁ, আমারও কাজ আছে। তারপর নেমন্তন্ন আছে।

বাবলি চুপ করে রইল। বাবলির খুব রাগ হচ্ছিল। নিজের ওপর তো বটেই। অভীর ওপরও। এতই যদি কাজ তাহলে রাত বারোটার সময় ফোন করে দেখা করতে বলা কেন? সত্যি সত্যিই ক্যাবলা লোকটা।

বাবলি ভাবল, এর সম্বন্ধে এ ক'দিনে মনে মনে যে সুন্দর ধারণাটা গড়ে উঠেছিল, তা বুঝি ভুল। ওর মনের ধারণাটা বুঝি ভুল। অভী নিতান্তই সাধারণ ছেলে। ঝুমার চেহারা দেখেই ঝুমা ওর প্রতি ইন্টারেস্টেড শুনেই বাবলির প্রতি সমস্ত ইন্টারেস্ট চলে গেছে। বাবলি মনে মনে রায় দিল যে, এসব বাজে ছেলে বাবলির যোগ্য নয়।

অভী একটা ট্যাক্সি ধরেছিল। বাবলিকে আবার কন্ট সার্কাসেই নামিয়ে দিল। ওখান থেকে বাস, স্কুটার, ট্যাক্সি, সবই পাওয়া সোজা।

বাবলি ট্যাক্সি থেকে নেমে, খুব জোরে দরজাটা বন্ধ করল। প্রায় অভীর কানে তালা লাগিয়ে।

অভী চমকে মুখ তুলে তাকাল বাবলির দিকে।

তারপর জানালা দিয়ে মুখ বের করে বাবলিকে বলল, এ্যাই! রাগ করলেন? সত্যিই কাজ আছে। বিশ্বাস করুন। আমি মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে জানি না। একটু বেরসিক আছি। কোনো দোষ হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন।

বাবলি হাসবার চেষ্টা করল। বোধহয় হাসলও হাত নাড়ল।

অভী আবার বলল, কাল সন্ধ্যে লাগতে না লাগতেই আপনাদের বাড়ি পৌঁছবো। কি কি খেতে ভালোবাসি মনে আছে তো? না আবার বলব?

পেছনে অনেক গাড়ি ছিল। এতক্ষণ ট্র্যাফিক লাইটটা লাল ছিল। কখন যে হলুদ হয়ে সবুজ হয়ে গিয়েছিল, খেয়াল ছিল না অভীর। পেছন থেকে প্রাইভেট গাড়ি, ট্যাক্সি ও ভটভটিয়ার এঞ্জিনের যুগপৎ আর্তনাদে এবং দাড়িওয়ালা এবং দাড়ি-ছাড়া পাঞ্জাবীদের শাঁখের আওয়াজের মতো সুখকর সম্বোধনে ট্যাক্সিটাকে আর দাঁড় করিয়ে রাখা গেল না।

বাবলি উত্তরে কি বলল, শোনা-হল না অভীর।

অভীর মনে হল এতগুলো গাড়ির সক্‌জস্ট পাইপের চোখ জ্বালা-করা ধোঁয়ার মধ্যে বাবলি বুঝি হারিয়ে গেল।

বাবলি এক গমগমে গর্বময় প্রত্যাশায় ভর করে আজ বিকেলে কন্ট সার্কাসে

এসে বাস থেকে নেমেছিল।

একটা ট্যাক্সিতে ও যখন উঠে বসল, তখন ও আশাভঙ্গতার গ্লানিতে, অপমানের ঘামে জবজবে হয়ে গেছিল।

ঘামে জবজবে হয়ে, একবুক অভিমান নিয়ে ও ট্যাক্সির পেছনের সীটের সঙ্গে গা এলিয়ে বসে রইল।

ট্যাক্সিটা হু-হু করে হাউজ-খাস এনক্লেভের পথে ছুটে চলল।

তখনো গরম রুক্ষ রাজস্থানী হাওয়া এসে থাপ্পড় মারতে লাগল ওর চোখেমুখে। ওর বুকের ভেতর পর্যন্ত এক অকারণ অবুঝ জ্বালায় জ্বলতে লাগল। বাবলি ঠিক করলো, বাড়ি গিয়ে অনেক—অনেকক্ষণ ধরে ও চান করবে।

সাত

সত্যি সত্যিই সন্ধ্যে লাগতে-না-লাগতেই অভী এসে পৌঁছেছিল ওদের বাড়িতে।

কাকা তখনও আসেন নি। কাকীমা বাড়ি ছিলেন।

সারা সকাল ও দুপুর ধরে কাকীমাকে সাহায্য করেছে বাবলি। ভিনিগারে স্যালাড ভিজিয়ে রেখেছে, চপের পুর বানিয়েছে, ফ্রায়েড রাইসের বন্দোবস্ত করেছে। আসল আসল পদ কাকীমা নিজেই রেঁধেছিল। বাবলি শুধু আনারসের চাটনিটা রেঁধেছিল।

কাকার কথামতন বীয়ার আনিয়ে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিল। ফিশফিঙ্গার সব ঠিক-ঠাক করে রেখেছিল, কাকা এলেই গরম ভেজে দেবে ওদের—যাতে বীয়ারের সঙ্গে খেতে পারেন ওঁরা।

চারটে বেজে যেতেই কাকীমা বলেছিলেন, তুই এবার হাউসকোট ছেড়ে গা-টা ধুয়ে নে বাবলি। অভী যদি তাড়াতাড়ি সত্যিই আসে, তাহলে ওর সঙ্গে কথা বলবে কে? আমার সবকিছু করে চান-টান সেরে আসতে দেরি হবে অনেক।

বাবলি বলেছিল, দাঁড়াও কাকীমা, স্যালাডটা সাজাই। তারপর বসবার ঘরে, খাওয়ার টেবিলে ফুল সাজাতে হবে না বুঝি?

খুব ভালো করে ফুল সাজিয়েছিল সব ঘরে বাবলি। দিল্লির এক জাপানী ভদ্রমহিলার 'ইকেবানা' স্কুলে কিছুদিন ক্লাসে করেছিল ও। অনেক কিছু শিখেছিল, কি করে কোন পাতার সঙ্গে কি ফুল কেমনভাবে সাজাতে হয়। আজ যেমন যত্ন করে মেঝেতে হাঁটুমুড়ে বসে ফুল সাজাতে বসল বাবলি, তেমন যত্ন ভরে কখনও সাজিয়েছে বলে ওর মনে পড়ল না।

কাকীমা শেষে ধমক লাগালেন। বললেন, কি রে? তুই চান করতে যাবি কি যাবি

না?

চান করে উঠে সাধারণ অথচ খুব সুন্দর করে সাজলো বাবলি। একটা সাদা খোল লাল পাড়ের টাঙ্গাইল শাড়ি পরল ও। সঙ্গে লাল-রঙা ব্লাউজ। চুড়ো করে খোঁপা বাঁধল। মধ্যে ফলস-খোঁপা ভরে। আলমারি খুলে রুবীর দুল পরল, রুবীর মালা একটা। চুলে হেয়ার-স্প্রে লাগালো। গায়ে হাল্কা করে ইন্টিমেট। তারপর লাল গোলাপ গুঁজল একটা চুলে, কানের পেছনে। চোখে কাজল লাগাল। লাল টিপ পরল সিঁদুরের ; কপালে।

সাজা শেষ হলে, আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সিন্ডারেলার মতো আয়নাকে শুধাল, বল তো আয়না, কে বেশি সুন্দরী? ঝুমা না বাবলি? বলো না আয়না?

আয়নার কাছ থেকে কোনো জবাব পাবে না জানত বাবলি। কিন্তু আয়নার সামনে মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়ে, নিজের দিকে নিজের সুস্নাতা, সুসজ্জিতা, সুগন্ধি শরীরের দিকে তাকিয়ে বাবলির খুব পছন্দ হল নিজেকে। দাঁতে দাঁত চাপলো বাবলি। বলল, ঝুমা—তুই জানিস না। তুই জানিস না। তোকে আমি হারিয়ে দেব। তোকে আমি বলে বলে হ্যান্ডস্‌ডাউন হারাবো।

অভী যখন এল, তখন বাবলির প্রসাধন শেষ হয়ে গেছে। তবুও ইচ্ছা করে নিজে দরজা খুলতে গেল না বেলের আওয়াজ শুনে। কিষাণ সিং গিয়ে দরজা খুলে বসাল অভীকে, বসবার ঘরে।

মিনিট পাঁচেক পরে, যেন জানেই না অভী কখন এসেছে, এমনভাবে বাবলি বসবার ঘরে ঢুকে অবাক হওয়ার ভান করে বলল, ওমা! কখন এলেন?

অভী কথা বলল না। একদৃষ্টে বাবলির দিকে চেয়ে রইলো।

অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ চেয়ে রইল।

বাবলির সেই সন্ধ্যেবেলার শান্ত, স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চোখ দুটি ওর দু'চোখ ভরে রইল। অভীর হঠাৎ মনে হল, এইরকম কোনো শান্ত স্নিগ্ধ দৃশ্য বুঝি ও আগে কখনও দেখে নি। ওর মনে হল এই জন্যেই বিবাহিত পুরুষেরা বুঝি অফিসের পর বাড়ি ফেরার জন্যে এত পাগলের মতো করে। তারপর সকলের জন্যেই কি এমন দৃশ্য অপেক্ষা করে থাকে? জানে না অভী। যদি থাকেই, তাহলে বলতে হয় বুদ্ধিমান লোক মাত্রেরই বিয়ে করা দরকার।

বাবলি পর্দার কোণায় দাঁড়িয়েছিল স্থাণুর মতো।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। তবুও যখন অভী কথা বলল না, বাবলি হাসল। বলল, কি দেখছেন এমন করে? আমি কি সাদা বাঘ?

অভী বলল, না। এমনিই দেখছি। আপনাকে ভালো দেখাচ্ছে। এই গরম হাওয়ায়

চোখে জ্বালা ধরে গিয়েছিল ট্যাকসিতে আসতে আসতে। চোখ জুড়িয়ে গেল আপনাকে দেখে।

তারপর চুপ করে থেকে বলল, আপনি কি সকলের জন্যেই এমন সুন্দর করে সাজেন?

বাবলি রেগে গেল। বলল, সকলের জন্যে মানে? আপনার কি ধারণা রোজই আমি এমন করে সেজে থাকি নতুন নতুন অতিথির জন্যে?

তারপর বলল, আমাকে এমন অসম্মানজনক কথা বলার অধিকার আপনাকে কে দিল? আমি তো দিই নি।

অভী প্রথমে অবাক হল। তারপর হেসে ফেলল।

বলল, নাঃ, আপনি বড় ঝগড়াটে। আমার মা একটা কথা বলতেন আমার এক কাকীমা সম্বন্ধে। বলতেন, ও বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করে। কথাটার মানে বুঝতাম না। আপনাকে দেখে এতদিনে বুঝলাম, বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করা কাকে বলে।

বাবলির মুখ অভিমানে গোলাপী হয়ে গিয়েছিল।

অভী কথা ঘোরাবার জন্যে বসবার ঘরের কোণার কটেজ-পিয়ানোটা দেখিয়ে বলল, আপনি বাজান? পিয়ানো?

বাজাতাম। কাটা জবাব দিল বাবলি।

বলেই, উল্টোদিকের সোফায় বসে পড়ল।

অভী বলল, পিয়ানো শুনতে আমার দারুণ লাগে। ডো-রে-মী-ফা সো-লা-টি-ডো।

বাবলি ঠাট্টা করার গলায় বলল, সাউন্ড অব মিউজিক দেখেছিলেন বুঝি? নইলে সা-রে-গা-মা-র ইংরাজি নাম শুনে এত শিহরণ হবে কেন?

অভী অপ্রতিভ হয়ে বলল, আপনি লোককে খুব অপদস্থ করতে পারেন। ইচ্ছে করে অপদস্থ করেন যখন-তখন। এমন করে খুব আনন্দ পান আপনি, না?

তারপরই বলল, বাজান না বাবা এত করে বলছি।

বাবলি বলল, থাক, অত পিয়ানো শুনে কাজ নেই।

একটু পরে বলল, কি খাবেন বলুন? কাকা আপনার জন্যে বীয়ার আনিয়ে রাখতে বলেছিলেন। ফ্রিজে আছে। আনি? খান ততক্ষণ, কাকা না আসা পর্যন্ত।

অভী বলল, বাঃ, নিমেষদার খুব দূরদৃষ্টি আছে তো। দিল্লির এই গরমে বীয়ার খাওয়া মন্দ না। তবে কিছু মনে করবেন না, আমি খাব না। আমার পৈটিক গোলযোগটা এখনও আছে।

বাবলি বলল, শুধু পৈটিক নয়, মনে হয় মানসিক গোলযোগও আছে।

ইতিমধ্যে কাকা এলেন।

এসেই বললেন, কি হে? কখন এলে?

—এই একটু আগে। বলে অভী উঠে দাঁড়াল।

কাকা বললেন, রাজীব আর সোমা এল না? ওদের এত করে বললাম।

অভী ওকালতি করল, বলল, ওয়েস্ট জার্মানীর অ্যামবাসাডরের বাড়ি ওদের একটা নেমন্তন্ন আছে, না গেলেই নয়।

কাকা টাই খুলতে খুলতে বললেন, তাহলে আর কি করবে? বাবলির অ্যামবাসাডর কি ওয়েস্ট-জার্মানীর অ্যামবাসাডরকে টেক্কা দিতে পারে?

বাবলি আবার রেগে উঠে বলল, বাবলির অ্যামবাসাডর মানে?

কাকা হেসে বললেন, বাবলির প্রতিভূ, আবার কি? আমি, আমি অন্য কেউ নই।

বলেই বাবলির দিকে চেয়ে বললেন, তুই অত চটে যাচ্ছিস কেন?

বাবলি বলল, না। আমার এরকম রসিকতা ভালো লাগে না।

কাকা অভীর দিকে চেয়ে চোখ নাচিয়ে বললেন, ভেবেছিলাম রাজীবের ভাইটা ভদ্র সভ্য। একা ঘরে বসে আমার অবলা ভাইঝিকে কি বলেছ হে ছোকরা যে, ভাইঝি আমার এমন চটিতং হয়ে আছেন? ওয়ার্থলেস্ তুমি? আমার মতোই ওয়ার্থলেস। কি করে মেয়েদের প্লিজ করে কথাবার্তা বলতে হয় তুমি কিছুই জান না। শেখ নি কিছুই।

তারপর সোফায় বসে পড়ে বললেন, বুঝলে অভী, আজ বাবলির মেজাজ গরম হওয়ার কারণ আছে। সকালবেলাতেই এক বুড়ো পাঞ্জাবী ভদ্রলোক অনেক মিঠাই মণ্ডা ফলটল নিয়ে হাজির বাড়িতে। জানা গেল বাবলির অ্যাসেসী—তাঁর ইনকাম ট্যাকসের কেস বাবলির কাছে। বাবলির কাছেই শুনলাম, বাবলি নাকি কি সব গোলমাল-টোলমাল ধরে ফেলেছে ব্যালান্স-সীটে।

ভদ্রলোক বাড়ি আসাতে বাবলি তো চটে গেল। ভদ্রলোককে অপমান করে তাড়িয়ে দিল বাড়ি থেকে। বুড়োর চোখে জল এসে গেল। বুড়ো বার বার বললেন যে, তোমার কাছে কোনো ফেভার চাইতে আসি নি আমি। আমার এক মেয়ে ছিল, হুবহু তোমার মতো দেখতে। তা-ই তোমাকে আমার বড় মায়া পড়ে গেছে। আমাকে এমন করে তাড়িয়ে দিয়ো না।

কিন্তু বুঝলে ভায়া, একে অফিসার তার উপর কড়া অফিসার—ইন্দিরা গান্ধীর দিল্লিতে এমন মেয়েদের দৌরাত্ম্যর কথা তো সে বুড়ো জানে না। সে অন্ধ অপত্যস্নেহে ভর করে বাড়িতে এসেছিল। অ্যাসেসীরা কেউ-ই যে মানুষ নয়, তারা যে সকলেই সন্দেহ করার, ভয় করার, অবিশ্বাস করার লোক, এ কথাটা বাবলি

বোধহয় ইতিমধ্যেই বুঝে ফেলেছে।

অভী বলল, বাবলিকে, বাবলির দিকে চেয়ে, সত্যিই তাড়িয়ে দিলেন?

কাকা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাড়িয়ে দিল—সমস্ত মিষ্টি ফলটল সমেত। আমার আবার মিষ্টি খুব ফেভারিট।

অভী বলল, এতক্ষণে বুঝলাম, উনি এত রেগে রয়েছেন কেন।

কাকা বললেন, বোঝ নি। কিছুই বোঝ নি। ও আসলে রাগল বুড়ো চলে যাওয়ার পরে।

আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম যে, বুড়োর ব্যালান্স-সীটে গোলমালটা কিসের? তখন বাবলি যা বলল তাতে বুঝলাম যে বাবলি ছেলেদের মন-টন যতটা বোঝে একাউন্ট্যান্সীটা ততটা বোঝে না। ভদ্রলোককে ও মিছিমিছি অপমান করল। আমার কাছে একথা শোনামাত্র ও সেই যে রাগল, তারপর থেকে রাগের পারা আর নীচে নামে নি।

বাবলি রেগে উঠে দাঁড়াল এবার।

বলল, কাকা, ভালো হচ্ছে না। একজন আউটসাইডারের সামনে আমার অফিস সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা আমার মোটেই পছন্দ নয়। বলেই, বাবলি রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কাকা কোটটা তুলি নিয়ে অভীর দিকে চোখ ফিরিয়ে দুষ্টুমির হাসি হেসে বললেন, কেমন বুঝলে হে?

তারপর টাইটা খুলে ফেলে বললেন, বাগ মানানো খুব শক্ত ; আর সমস্ত মজাটা তো সেইখানেই। তবে আমার ভাইঝির মতো মেয়ে হয় না—জেম্ অফ্ আ গার্ল। সব দিকে দিয়ে।

তারপর ফিসফিস করে বললেন, আমি ঘাস খাই না তোর দাদার মতো। তোর পছন্দ ভালো। লেগে থাক্। আরে তেজী ঘোড়াকে বাগ মানানোর মজাই আলাদা—দু চার বার চাঁট্টি খাবি, চাঁদি ফেটে যাবে—তাতে কি? মরদের বাচ্চা হবি তো তেজী ঘোড়ায় চাপবি। তুইও কি তোর দাদার মতো ভালোমানুষ নাকি? তুইও কি দা র‍্যাম্ব? মেয়েদের কথায় উঠবি বসবি?

অভী কিছু জবাব দেবার বা ভালো করে বোঝবার আগেই কাকা উঠে দাঁড়িয়ে কোট কাঁধে ঝুলিয়ে বাবলির ঘরের দিকে গেলেন।

অভী শুনতে পেল, বাবলিকে উনি বললেন, ওরে, বাইরের লোক ঘরে বসে আছে। সে তো আর ভেতরের ঘরে আসতে পারে না। যা যা, তুই-ই যা। নেমন্তন্ন করে লোকে অতিথির সঙ্গে এমন ব্যবহার করে?

তারপরই কাকা জোরে জোরে রবীন্দ্রনাথের গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে নিজের ঘরের দিকে গেলেন—'ওরা পরকে আপন করে, আপনারে পর।'

একা ঘরে বসে দাদার বন্ধু নিমেষদাকে দেখে-শুনে অভী হেসে উঠল। বেজায় রসিক আর সরল তো ভদ্রলোক। সত্যিই দাদার সঙ্গে কোনো মিলই নেই।

বাবলি একটু পরে ফিরে এল ঘরে বাচ্চা মেয়ের মতো মুখ ফুলিয়ে। ঝুপ করে বসে পড়ল সোফায়।

অভীর ওকে দেখে আশ্চর্য লাগছিল। ও যে গম্ভীর বুদ্ধিমতী, ম্যাচিওরড মেয়েটিকে জানত তার সঙ্গে এ বাবলির কোনোই মিল নেই।

বাবলি মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল।

অভী বলল, আপনাকে এমনিতেই সুন্দর দেখায়, রাগলে যে এত সুন্দর দেখায় তা জানতে পেতাম না আজ আপনার বাড়ি না এলে।

তারপর বলল, একটা কথা বলব?

বাবলি মুখ তুলে বলল, কি?

—মেয়েদের সেন্‌স অব হিউমার কম। আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আপনি তার ব্যতিক্রম। আপনার দারুণ সেন্‌স অব হিউমার আছে বলেই আমার ধারণা ছিল। আপনিও যে অন্য মেয়েদের মতো, তা আমার জানা ছিল না।

বাবলি বলল, অন্য কথা বলুন।

—কি কথা?

ইতিমধ্যে কাকীমা ঘরে এসে ঢুকলেন।

অভী দাঁড়িয়ে উঠে বলল, কেমন আছেন বৌদি?

কাকীমা জবাব না দিয়ে বাবলিকে ভর্ৎসনার গলায় বললেন, তুই কি রে বাবলি? এতক্ষণ ওকে বসিয়ে রেখেছিস, বীয়ার-টিয়ার কিছু দিস নি?

বাবলি ঠাট্টার গলায় বলল, পৈটিক গোলযোগ।

অভী বলে উঠল, না না বৌদি, খাব। আপনি বললে খাব।

বৌদি তক্ষুনি বেরিয়ে গিয়ে কিষাণ সিং-এর সঙ্গে ফিরে এলেন, ট্রে-তে ঠাণ্ডা বীয়ারের বোতল, বীয়ার মাগ বসিয়ে সঙ্গে ফিশ-ফিঙ্গার নিয়ে প্লেটে।

তারপর সেগুলো নামিয়ে রেখেই আবার চলে গেলেন বোধহয় দাদাকে জামাকাপড় দিতে।

বাবলির ঠোঁটের কোণায় হাসি ফুটে উঠল। ও ভাবল, কাকীমা বীয়ারটা নিজেই আনতে পারতেন কিন্তু মেয়েরা নিজেরা পানপাত্র ও সুরা নিয়ে এলে বুঝি সাকী সাকী মনে হয়।

বাবলির হাসিটা অভীর চোখে পড়ে থাকবে। অভী শুধাল, আপনি হাসছেন কেন?

—এমনিই। বাবলি বলল, এমনি হাসছি।

বলেই উঠে এসে অভীকে বীয়ারের বোতল খুলে বীয়ার ঢেলে দিল।

বলল, খান।

তারপর বলল, আমার কথায় খাওয়া গেল না, কাকীমা বলতেই খাওয়া হল। বেশ বেশ।

অভী হাসল। বলল, আপনি খাবেন একটু শ্যান্ডি?

বাবলি ঠোঁট বেঁকাল।

বলল, আমার ওসব মেমসাহেবী ভালো লাগে না।

অভী একথায় মনে মনে খুশি হল।

পরমুহূর্তেই ভাবল, এখনও ও নিজে বেশ পুরাতনপন্থী ও স্বার্থপর আছে। নিজেরা সব কিছু করে, করতে পারে, কিন্তু মেয়েরা সেই জিনিস করলে চোখে লাগে; অপছন্দ হয়। হয়তো ও গোঁড়া, হয়তো ও পুরাতনপন্থী কোনো বিশেষ ব্যাপারে—কিন্তু তবুও অভীর খুব ভালো লাগল জেনে যে, বাবলি ড্রিংক করে না।

বাবলি বলল, যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই, আপনি যদি বিয়ে করেন, তাহলে আপনার স্ত্রীর ড্রিংক-করা আপনি পছন্দ করবেন?

অভী কি ভাবল একটু। তারপর বলল, বোধ হয় না।

বাবলি বলল, জানতাম। সব ছেলেরাই একরকম।

—মানে? বলে অভী চোখ তুলে তাকাল।

বাবলি বলল, সব ছেলেরাই পরস্ত্রীর ড্রিংক করাটা পছন্দ করে, নিজের স্ত্রীরা ড্রিংক করুক এটা কোনো আধুনিক ছেলেরই পছন্দ নয়।

অভী নিজেকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করল না। চুপ করে রইল।

হঠাৎ বাবলি কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, তাহলে কাল চলে যাচ্ছেন? সকালের ফ্লাইটে?

—না। বিকেলের ফ্লাইটে। যাবেন এয়ারপোর্টে?

—না। বাবলি বলল, গিয়ে কি হবে? আরো কত লোক তো যাবে।

অভী বলল, কত লোক নয়। দাদা-বৌদি ও আমার দু-একজন বন্ধু-বান্ধব। আপনি যদি বলেন, তাহলে তাদের সকলকে যেতে মানা করে দিতে পারি। তাহলে কি আপনি খুশি হবেন?

—আমি তো তা বলি নি।

—তাহলে কি? আপনি যদি এতই একা-একা থাকা ভালোবাসেন তাহলে আসুন ইম্ফলে। সেখানে আপনাকে সব সময় কম্পানি দেবো। আমি ছাড়া আপনার কাছে আর কেউই থাকবে না। আপনি আমাকে জানার, কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাবেন।

তারপরই গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, পরীক্ষায় তো আমি ফেলও করতে পারি। পরীক্ষা আপনার নেওয়া উচিত।

বাবলি হাসল।

আলো-ভরা বসবার ঘরে লেমন-ইয়েলো ফোম-লেদারের সোফায় বসে থাকা বাবলিকে সত্যিই ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিল।

বাবলি বলল, আর আমি? আমারও পরীক্ষায় বসতে হবে তো।

অভী মুখ তুলল। বলল, হয়তো আপনি পরীক্ষায় না বসেই পাস করে গেছেন।

বাবলি বলল, না। তা কেন হবে? সেটা ঠিক নয়। কোনো সময়েই কোনো অনুযোগ যেন না থাকে। কোনো ভুল বোঝাবুঝি যেন না থাকে। আমি পরীক্ষায় বসতে চাই। আপনারই মতো।

অভী বীয়ার মাগে এক চুমুক দিয়ে বলল, বেশ তো। তা-ই-ই হবে। দুজন পরীক্ষার্থী এবং দুজনই পেপার-সেটার। পরীক্ষাটা কেমন হবে তা-ই ভাবছি। কোনোরকম নেপোটিজম্ হবে না তো?

বাবলি হেসে ফেলল। বলল, জানি না।

তারপর কাকা এলেন চান করে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে। এসেই বীয়ারের গ্লাসে এক বড় চুমুক লাগিয়েই বললেন, আয় বাবলি, আমরা দুজনে সেই গানটা গাই।

অভী বলল, অবাক গলায় বাবলির দিকে তাকিয়ে, আপনি গানও গান নাকি?

বাবলি লজ্জা পেল। মাথা নাড়াল। বলল, না না।

তারপর কাকার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, কি হচ্ছে কাকু? তুমি এসেই আবার গণ্ডগোল শুরু করলে?

কাকা গম্ভীর হবার ভান করে বললেন, হ্যাঁ, এখন তো আমিই যত গণ্ডগোলের গোড়া। আমাকে এখন সমূলে উৎপাটন করার সময় হয়েছে তোমার। কাকার দিন ফুরিয়েছে।

বাবলি কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, তুমি আর কাকীমা অভী থাকতে থাকতে একবার ঘুরে এস না ইম্ফল?

কাকা বললেন, কেন, আমার বন্ধুর ছোট ভাইয়ের ঘাড়ে কেন উঠব, তোর মেসো-মাসীর অমন শক্ত ঘাড় থাকতে? উঠলে, ওদের কাছেই উঠব। যা কিপ্টে তোর মেসো। যাব তো ভেবেছি কতবার, একবারও কি নেমন্তন্ন করল?

বাবলি বলল, কীই-ই-ই খারাপ তুমি কাকু। কতবার মাসী ও মেসো লিখেছে তোমাকে। তুমি ভীষণ খারাপ লোক।

কাকা আরেক ঢোক বীয়ার গিলে বললেন, এখন সব খারাপ লাগবে। কাকাকে ভালো লাগার দিন ফুরিয়ে গেছে। কি বল্ বাবলি।

একটু পর কাকীমা এসে বসলেন।

অভীকে বললেন, যখন খেতে ইচ্ছে করবে, তার পনরো মিনিট আগে বলবে অভী, আমি আর বাবলি সব ঠিকঠাক করব, কেমন?

অভী বলল, আচ্ছা।

তারপর অনেক গল্পগুজব হল। ইম্ফলের গল্প, কোহিমার গল্প। কোহিমা থেকে ডিমাপুর যাওয়ার পথে ওদের সেই নাগা কাঠুরের কুঁড়েতে রাত কাটাবার গল্প।

গল্পে গল্পে অনেক রাত হল। একসময় কাকীমা উঠে গেলেন। বাবলিও গেল কাকীমাকে সাহায্য করতে।

তারপর খেতে বসল ওরা সকলে।

খেতে বসে অভী বলল, বাঃ, ফুল কে সাজিয়েছে বৌদি? ভীষণ সুন্দর সাজানো হয়েছে কিন্তু! আপনি?

বৌদি বললেন, আমি নই, বাবলি।

বাবলি! অভী ভাবল।

বাবলি মনে মনে খুশী হল। ও ভালো ফুল সাজায়, একথা ও জানে। সে জানায় কোনো নতুনত্ব নেই। কিন্তু পুরুষদের, বেশির ভাগ পুরুষদের চোখেই এসব পড়ে না। তাদের বেশির ভাগই জানে না, কি করে মেয়েদের এবং মেয়েদের নিজস্ব মেয়েলি গুণ স্বীকার করতে হয়। বাবলির ভেবে ভালো লাগল যে, অভী অন্য দশজন ছেলের মতো নয়।

গল্প-গুজব করতে করতে ওরা সকলে একসঙ্গে বসে খেল।

খাওয়া শেষ হতে প্রায় এগারোটা বাজল।

অভী খাওয়া শেষ করে উঠেই বলল, এবার কিন্তু আমাকে উঠতে হবে। তারপর কাকার দিকে ফিরে বলল, নিমেষদা, ফোনে আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন?

কাকা ধমকে উঠে বললেন, তোমার কি ব্যাপার বল তো? তুমি কি আমার চাকরিটা খাবে? বাড়িতে গাড়ি থাকতে তোমাকে যদি এখন ট্যাক্সি করে যেতে দিই, তাহলে বাবলি কি আমাকে আস্ত রাখবে?

তারপরই কাকা গাড়ির চাবিটা দিয়ে বাবলিকে বললেন, এবার যা, অতিথির সঙ্গে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছিস, এখন তার পাপ স্খালন করতে যা, অভীকে বাড়ি

পৌঁছে দিয়ে আয়।

বাবলি বলল, আমি কেন? তুমিই যাও।

কাকা বললেন, ও তো প্রায় খায় নি কিছুই। কিন্তু আমি? আড়াই বোতল বীয়ার, তার ওপর গাণ্ডে-পিণ্ডে খাওয়া—আমি এখন কোথায় নড়ছি না—বলেই চারধার দেখে নিয়ে যখন দেখলেন কাকীমা রান্না ঘরে, তখন নির্ভয়ে বললেন আমি এখন আমার বউকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোব বাবা। তোমাদের যেখানে যাবার যাও।

বাবলি গ্যারেজ থেকে যখন কাকার সাদা-রঙা ফিয়াট গাড়িটা বের করল, তখন এগারোটা বেজে পনরো।

বাবলি বেশ জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। দিল্লিতে রাত এগারোটা অনেক রাত। দিল্লি কোলকাতার মতো নয়। এখানে সকলেই সকাল-সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা এত দূর যে, বড় কেউ একটা রাতে বেরোয় না। হু হু করে হাওয়া লাগছিল চোখে মুখে। বীয়ার এবং খাওয়া-দাওয়ার পর অভীর ঘুম ঘুম পাচ্ছিল।

কোন পথ দিয়ে বাবলি যাচ্ছিল, অভী জানে না। পথটার দুধারে বড় বড় গাছ। সুন্দর দেখাচ্ছে রাস্তাটা, মার্কারী ভেপার ল্যাম্পগুলোতে ভীষণ মোহময় স্বপ্নময় লাগছে।

হঠাৎ অভী বলল, গাড়িটা থামান তো বাঁদিকে!

বাবলি বলল, কেন? কি হবে?

অভী যেন আদেশের সুরে বলল, থামাতে বলছি, থামান।

বাবলি এই স্বরে অভ্যস্ত ছিল না। অভী যে ওকে আদেশ করতে পারে, বাবলি ভাবতে পারে নি। কিন্তু বাবলির খুব ভালো লাগল। বাবলিকে ছোটবেলা থেকে কেউ কখনও আদেশ করে নি। কারো আদেশ মানার মধ্যে যে এত আনন্দ তা ওর জানা ছিল না। ও যে কারো আদেশ বিনা প্রতিবাদে মানতে পারে, এ কথাও নিজে জানত না।

বাবলি গাড়িটা থামালো বাঁদিক ঘেঁষে। গাড়ি থামিয়ে বলল, থামিয়েছি।

অভী বলল, গাড়ি বন্ধ করে দাও।

বাবলির হঠাৎ মনে হল, অভীর কী হল? নেশা হয় নি তো? বাবলিকে বিনা ভূমিকায় এমন তুমি করে সম্বোধন করছে কেন ও?

কথা না বলে বাবলি বলল, করেছি, বন্ধ করেছি।

অভী কোনো কথা না বলে বাবলির দিকে সরে এল। সরে এসে দুহাতে বাবলির মুখটা ধরে ওর চোখে চুমু খেল।

বাবলি বাধা দিল না, মানা করল না, বাবলির সমস্ত শরীর এক আশ্চর্য আবেশে অবশ হয়ে এল।

বাবলি অস্ফুটে বলল, উঁ উ উ-উ...।

অভী তারপর দুহাত দিয়ে বাবলিকে জড়িয়ে ধরল। জড়িয়ে ধরে, বাবলির ঠোঁটটাকে নিজের ঠোঁটের মধ্যে নিয়ে একেবারে শুষে নিল। শুষে নিতে লাগল।

বাবলির হাত আলগা হয়ে এল স্টিয়ারিং থেকে। কখন ও যে তা করল ও তা জানে না, বাবলির অজান্তে বাবলির হাত দুটি অভীর গলা জড়িয়ে ধরল। বাবলি তা সজ্ঞানে করল না। বাবলির মস্তিষ্কের কোষে কোনো অজ্ঞাত আদেশ বাজল নীরব স্বরে। বাবলি তার দুটি লতানো হাতে, তার নরম শরীরের সব সুগন্ধ সব স্নিগ্ধতা সব নম্রতা এই প্রথম, জীবনে এই প্রথম একজন পুরুষের সবল কঠিন বুকে সঁপে দিয়ে, নিজের ঠোঁটের সব স্বাদ, মিষ্টিত্ব একজন পুরুষের সিগারেটের গন্ধেভরা রুক্ষ ঠোঁটে সমর্পণ করে নিজে ধন্য হল।

কতক্ষণ ওরা ওভাবে ছিল ওরা জানে না।

দূর থেকে, পেছন দিক দিয়ে একটা গাড়ি আসছিল।

তার হেডলাইটের আলোর বৃত্ত দুটি বাবলির গাড়ির আয়নার মধ্যে দুটি ছোট বিন্দু থেকে ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল।

পেছনের গাড়ির আলোটা দ্রুত বড় হচ্ছিল, দ্রুত কাছে এগিয়ে আসছিল। এবার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল।

অভী বাবলির বুকের ভাঁজে মুখ রেখে বিড়বিড় করে বলল, ইম্ফলে আসবে তো?

বাবলি যেন ঘুমের মধ্যে ঘোরের মধ্যেই বলল, আসব আসব। তুমি দেখ ; ঠিক আসব।

তারপর ওরা সরে গেল।

বাবলি গাড়ি স্টার্ট করল।

এমন সময় পেছনের গাড়িটা ওদের ওভারটেক করেই ওদের একেবারে সামনে ব্রেক কষে দাঁড়াল।

হঠাৎ ওরা অবাক হয়ে দেখল, বাবলির কাকা এবং অভীর নিমেষদা ট্যাক্সি থেকে নামলেন। তারপর পান চিবোতে চিবোতে ওদের গাড়ির দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর ঝুঁকে পড়ে অভীর দিকের জানালা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে অভীর কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, সাবাস্ ছোকরা, তুমি তো রীতিমত ফাস্ট ওয়ার্কার হে!

তারপরই বাবলিকে বললেন, এতদিনে তুই গাড়ি চালাতে শিখেছিস। খুব খুশী

হলাম।

অভী গাড়ির দরজাটা খুলে দিতে যাচ্ছিল পেছনের।

নিমেষদা বললেন, পাগল! আমি কি অমন বেরসিক? তোমাদের কাকীমা বললেন দিল্লিতে মেয়েরা আজকাল খুব আনসেফ্—তুমি ট্যাক্সি নিয়ে যাও, ফেরার সময় বাবলির সঙ্গে ফিরো—একা একা রাতে ওর এতখানি পথ আসা ঠিক হবে না।

বুঝলি বাবলি, তোর কাকীমা বুঝতে পারে নি যে বিপদ ছিল যাওয়ার পথেই; ফেরার পথে না।

অভী আবার বলল, নিমেষদা, আসুন না ; উঠে আসুন।

কাকা বললেন, আমি আগে পাইলটিং করে যাচ্ছি। তোমাদের বাড়ির নিচের পানের দোকানে মুস্কিপাতি জর্দা দিয়ে দুটো মঘাই পান খাব। তোমরা আস্তে আস্তে এস। তাড়া নেই। টেক ইওর ওন টাইম। দ্য নাইট ইজ ভেরী ইয়াং।

ট্যাক্সিটা এগিয়ে যেতেই বাবলি চাপা হাসি হাসল।

বলল, কাকুটা এত অসভ্য না!

বাবলি কথা শেষ করতে পারল না, বাবলির মুখ বন্ধ করে দিল অভী চুমু খেয়ে।

বাবলি আনন্দে, নতুন অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠল। বলল, আর না। এখন আর না। প্লিজ, এখন আর না অভী ; এখন আর না।

অভী ওকে ছেড়ে দিয়ে বলল, বল, ইম্ফলে আসবে তো?

বাবলি অভীর বুকে মুখ রেখে বলল, আসব আসব। তুমি দেখো, ঠিক আসব। আসি কিনা দেখো!

আট

বাবলির ভাবতেই ভালো লাগছিল। কত মাস পরে দেখতে পাবে অভীকে। প্রেসারাইজড প্লেনের ভিতরে বসে শুনতে পাওয়া মৃদু গুন্‌গুনানির মতো ওর মনও গুন্‌গুন্ করছিল।

আগে সবাই বলত কৈরাঙ্গী। কৈরাঙ্গী এয়ারস্ট্রীপ। কংক্রীটের ছিল না। তখন এক ফালি সবুজ মাঠ শুধু।

কিন্তু এখন যেখানে প্লেন নামে ইম্ফলে, সেখানে এয়ারপোর্ট, নাম তুলিহাল।

নাগা পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে অনেকক্ষণ ফকার-ফ্রেন্ডশিপ প্লেনটা উড়ে আসে শিলচর থেকে। তারপরই, হঠাৎ, স্বপ্নের শাংগ্রিলার মতো—দুটো উঁচু

পাহাড়ের মাঝের ফাঁক ফুঁড়ে প্লেনটা চিলের মতো ছায়া ফেলে ইম্ফল উপত্যকার উপর।

সবুজ, সবুজ, চারদিকে যতদূর দেখা যায় শুধু হলুদ, আর সবুজ। পাকা ধানের হলুদ, কাঁচা ধানের সবুজ। ইম্ফল উপত্যকাকে অনেকে বলেন, "গ্রানারী অফ গড।"

উপর থেকে দেখা যাচ্ছিল, এয়ারপোর্টের পাশে গাড়ি, জীপ, ট্রাক সব দাঁড়িয়েছিল।

প্লেনটা নামছিল। পেটের তলার চাকা-দুটো একটা ঝাঁকি দিয়ে আগেই নেমে পড়েছিল নীচে। ধীরে ধীরে নীচের বাড়ি, গাড়ি, জমি সব কাছে চলে এল—ধ্বসস্-ধ্বসস্ করে প্রথমে সামনের চাকাটা তারপর পিছনের চাকাদুটো মাটি ছুঁল। তারপর ট্যাক্সিংই করে এসে প্লেনটা স্থির হয়ে দাঁড়াল টারম্যাকের উপর।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় বেড়ার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে-থাকা বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের নিতে আসা ও বিদায় দিতে-আসা লোকজনের দিকে তাকাল বাবলি।

ও ভেবেছিল, সকলের মাথা ছাড়িয়ে ও অভীর মাথা দেখতে পাবে। হ্যান্ডসাম, ভালো, স্মার্ট ; সত্যিই স্মার্ট, অভীকে। বাবলির একান্ত অভীকে।

কিন্তু কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ও যখন প্যাসেঞ্জারস্ লাউঞ্জে এসে ঢুকল, তখনও অভীর দেখা পেল না।

শুধু অবাকই নয়। রীতিমত ক্ষুব্ধ হল বাবলি।

আসার তারিখ জানিয়ে শেষ চিঠি লিখেছিল ও। তার উত্তরে মস্ত বড় চিঠি পেয়েও ছিল অভীর কাছ থেকে। টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল তিনদিন আগে অভীকে এয়ারপোর্টে আসতে বলে। তা সত্ত্বেও এয়ারপোর্টে ওকে নিতে না-আসার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না ও।

অভীর অসুখ-বিসুখ করে নি তো?

এ-কথা ভেবেই ওর মনটা দ্রবীভূত হয়ে গেল। ভাবল, আহা বেচারা! বিদেশ-বিভুঁই জায়গা ; একেবারে একা থাকে। হয়তো জ্বরের ঘোরে বেহুঁশই হয়ে আছে। অভীর অসুখের কথা মনে হওয়ায়—দুঃখের সঙ্গে একরকম ভালো লাগাতেও ওর মন ছেয়ে এল। অভীকে ও অনেক যত্ন করবে, সেবা করবে, ওর কপালে ওডিকোলনের পটি দেবে, থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখবে, নিয়ম করে ওষুধ পথ্য খাওয়াবে—দরকার হলে সারারাত জেগে বসে থাকবে ওর মাথার কাছে। এমন কি, বাবলি কল্পনায় অভীর ঘরও যেন দেখতে পেল, যে ঘর ও কখনও দেখে নি। অভীর ঘর, ঘরের আসবাবপত্র, অভীর শয্যাশায়ী চেহারা, সবই যেন ওর চোখের সামনে

ফুটে উঠল!

মনে মনে অভীকে ক্ষমা করে দিল বাবলি।

কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা হল, যাবে কি করে অভীর বাড়িতে? বাড়ি তো চেনে না। তারপর নিজেই মুশকিল আসান করল এই ভেবে যে, মেসোমশায়ের অফিসের দারোয়ান বা কেয়ার-টেকারের কাছ থেকে ঠিকানাটা যোগাড় করে নেবে।

প্যাসেঞ্জার-লাউঞ্জে বেশ অনেকক্ষণ বসে থাকার পর মালপত্র এল প্লেন থেকে। ওর স্যুটকেসটাও এসে পৌঁছল, কিন্তু তখনও অভী এল না। অভীর আসার আর কোনোই সম্ভাবনা নেই। একথা বোঝাল ও নিজেকেই।

এয়ারপোর্টে ট্যাক্সি দেখতে পেল না। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের বাসেই যাবে ঠিক করল।

ট্যাগ মিলিয়ে স্যুটকেসটা বের করে যখন বাসে তোলার বন্দোবস্ত করছে, এমন সময় দূর থেকে একটা ঘন বাদামী-রঙা গাড়িকে আসতে দেখল এয়ারপোর্টের দিকে প্রচণ্ড বেগে।

গতবারে এখানে এসে যাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল বাবলি, তাদের মধ্যে কারোরই এ-রঙের গাড়ি নেই।

অতএব গাড়িটার দিকে না-চেয়েই চিন্তান্বিত মুখে বাবলি বাসে উঠে পড়ল।

গাড়িটা ততক্ষণে এসে গেছে।

গাড়িটা থামতেই, বাঁদিকের দরজা খুলে ঝুমা দৌড়ে নামল—নেমেই দৌড়ে এসে এদিক-ওদিক কাকে যেন খুঁজতে লাগল।

ঝুমা এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে তারপর এয়ার-হোস্টেসদের মধ্যেই একজনকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল, বলল, হাই!

ঝুমা এয়ার-হোস্টেসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল।

বাসের জানালায় বসে বাবলির মনে হল ঝুমা তার বন্ধু এয়ার-হোস্টেসকে বাবলির মতো কেউ এসেছে কিনা সেকথা জিজ্ঞেস করছে।

ইতিমধ্যে অভীও নেমে এসেছে গাড়ি থেকে।

একটা নেভী-ব্লু কর্ডুরয়ের ফ্লেয়ার পরেছে অভী, তার উপরে সাদা কলারওয়ালা গেঞ্জী। গায়ে নেভী-ব্লু ব্লেজার। ব্লেজারের পিতলের বোতামগুলো, অভীর সান-গ্লাসের কাঁচ ও অভীর হাসতে-থাকা দাঁত, রোদে ঝিক্‌মিক করছে।

বাবলি এই ঝকঝকে পুজো-পুজো রোদভরা সকালেও গায়ে-জল-পড়া বেড়ালনীর মতো মিইয়ে গেল।

প্রথমেই ওর মনে হল যে, রিটার্ন-ফ্লাইটে একটা সীট পেলে ও এখুনি দমদম

হয়ে দিল্লি ফিরে যায়। কিন্তু কি করবে ও বুঝতে পারল না।

যেদিকে ঝুমা ও অভী ছিল, তার বিপরীত দিকে ও চেয়ে রইল, যাতে ওদের চোখে না পড়ে ও। ওরা ওকে দেখতে না-পেয়ে ফিরে গেল, একটা দিন কোনও হোটেলে কাটিয়ে ও কালই আবার দিল্লি ফিরে যাবে। আর যদি অভীরা ফিরে চলে যায় এখুনি, তবে তো আজই যাবে। নিশ্চয়ই যাবে।

অন্যদিকে চেয়ে, শক্ত করে গ্রীবা ঘুরিয়ে বসেছিল বাবলি।

এমন সময় একেবারে ওর কানের কাছে ঝুমার গলা পেল ও।

ঝুমা বলল, অ্যাই বাবলি!

ঝুমার গলার সুরে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। সহজ বন্ধুত্বের উদার সুরই ছিল তাতে। ঝুমা বাবলির কাঁধে হাত রেখে ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে বলল, চল্ শীগ্‌গির। তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবলি ধরা পড়ে গেছিল। তখন না-নেমে উপায় ছিল না। নইলে লোকজনের সামনে যাত্রা করতে হত।

বাস থেকে নামতেই অভী হাত জোড় করে নমস্কার করে বলল, স্বাগতম্। আমি হোটেল দ্য অভীর ম্যানেজার। আপনাকে নিতে এসেছি। আই উইশ উ্য আ ভেরী হ্যাপী হলিডে।

বাবলি ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করল।

একটু দুঃখ ও আনন্দ মেশা হাসিতে বাবলির ঠোঁট ভরে গেল। অনেকদিন পর অভীকে দেখে ভারি ভালো লাগল বাবলির।

অভী বাবলির স্যুটকেসটা তুলতে তুলতে বলল, বাবাঃ, এত ভারী কেন? সোনা-টোনা আনলেন নাকি স্মাগল্ করে?

বাবলি অনেক কষ্টে স্বাভাবিক হল। স্বাভাবিক করল নিজেকে। ঝুমার সামনে নিজেকে ছোট করতে রাজী ছিল না ও।

বলল, সোনা নয় তবে অনেক পাটালি গুড় আছে। কাকীমা দিয়ে দিয়েছেন আপনার জন্যে। কোলকাতা থেকে দিল্লিতে আনিয়ে—দিল্লি থেকে ইম্ফলে পাঠিয়েছেন আপনার জন্যে শুধু।

ঝুমা অভীকে বলল, তুমি বুঝি খুব পাটালি গুড়ের ভক্ত অভীদা? 'তুমি' কথাটা বাবলির কানে ধক্ করে লাগল।

বাবলি বুঝল, এই পুজোটা মিছিমিছি নষ্ট করল ও। দিব্যি দিল্লির কালীবাড়ির পুজোতে মজা করা যেত। দিল্লির বাঙালিদের কাছে পুজো একটা খুব বড় ব্যাপার। কোলকাতার বাঙালিদের চেয়েও হয়তো বড়। পুজো একটা সম্মিলনী—সত্যিকারের

রি-ইউনিয়ন। কত লোকের সঙ্গে মেলামেশা হত। কত বান্ধবী আর বন্ধু ওর। তা না, সব ছেড়ে এই পচা ইম্ফলে মরতে এল বাবলি। রাক্ষুসীটা এতদিনে অভীর মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছে। কি করে এরই মধ্যে ঝুমার সঙ্গে অভীর এতখানি অন্তরঙ্গতা হল, বাবলি বুঝতে পারল না। কিন্তু অভী ঘুণাক্ষরেও এই অন্তরঙ্গতার কথা জানায় নি বাবলিকে। এতেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, এই অন্তরঙ্গতা অভীও গোপন রাখতে চেয়েছিল।

বাবলির কানে কানে ঝুমা বলল, কনগ্রাচুলেশানস্।

তারপর বলল, তুই যে এত বড় চালাক আর মিথ্যাবাদী তা আমি জানতাম না। যাই-ই হোক, দমদমে সেদিন যা বলেছিলাম, তা ভুলে যাস। আমি এয়ার-হোস্টেস। দিনের মধ্যে অনেকবার মুখের মেক-আপ ধুতে হয় আমাদের। আমার সেই ভুল করে, ভুল লোককে ভালোবাসার ভুল ধুয়ে ফেলতে সময় লাগে নি। আমি কম্‌পিটিটর নই। তুই আমাকে ভুল বুঝিস না।

তারপর হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, তোকে আমার এইটুকুই বলার ছিল। অভীদা তোর সম্বন্ধে সব কিছু বলেছে আমাকে। তবে, তুই যদি বলতিস যে তুই চিনিস অভীদাকে, তাহলে হয়তো আমি আমার নিজের কাছে এত বড় একটা প্রবলেম হতাম না। তোর কাছেও হয়তো ছোট হতাম না।

অভী এসে দরজা খুলে স্টিয়ারিংয়ে বসল। দুম করে দরজা বন্ধ করল।

ঝুমা সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোক হয়ে গিয়ে বলল, বাবাঃ, আনন্দের চোটটা দরজার উপরে কেন?

অভী হেসে ফেলল। কিন্তু জবাব দিল না।

পথে বাবলি বিশেষ কথা বলছিল না। যা বলার ঝুমাই বলছিল। নিজে হাসছিল, ওদের হাসাচ্ছিল। পেছনের সীটে বসে বাবলিও দুহাত অভীর প্রায় দুকাঁধের উপরে রেখে, সমানে বক্‌বক্ করছিল।

কথা খুব ভালো বলে ঝুমা। ঝুমার মতো ভালো কথা বলতে পারে এমন কাউকে বাবলি অন্তত জানে না।

হঠাৎ অভী বলল ঝুমাকে, এখন তো তোমার বান্ধবী এসে গেছে, এবারে তো আর তোমার আমার বাড়িতে থাকতে আপত্তি নেই। তবে চল, তোমার হোটেল ঘুরে যাই। স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে যাই একেবারে।

বাবলির গা রাগে জ্বালা করতে লাগল।

ও এখানে এসেছিল অনেক আশা নিয়ে। অভীর সঙ্গে একা থাকবে, গাড়ি করে দুজনে ঘুরবে অনেক জায়গায়। ঝুমার সঙ্গে এবং ঝুমার খপ্পরে যে তাকে থাকতে

হবে, এ তার জানা ছিল না।

বাবলির নীরবতা দেখে, ঝুমা বলল, নাঃ নাঃ, আমি হোটেলেই থাকব। সব গুছিয়ে-টুছিয়ে বসেছি, আবার ঝামেলা করা কেন? তাছাড়া আর ক'দিনই বা থাকব?

অভী অবাক হল। একবার চকিতে বাবলির মুখের দিকে তাকিয়েও নিল ও। তারপর বলল, সে কি? তুমি না বলেছিলে, ছুটি নিয়েছ—এখানেই কাটাবে পুজোটা?

বলেছিলাম।

হেসে বলল, ঝুমা।

তারপর বলল, ছুটি নিলে বুঝি ছুটি ক্যানসেল করা যায় না?

অভী বলল, বাবলি কি বলছে?

বাবলি বলল, আমি আবার কি বলব? ঝুমা সঙ্গে থাকলে তো মজাই হত, কিন্তু ওর বোধহয় মজা হবে না আমার সঙ্গে থাকলে। ওকে জোর করা কি ঠিক হবে?

ঝুমা আবারও হাসল।

হেসেই বলল, যা বলেছিস বাবলি। ঠিক হবে না।

বাবলি মনে মনে খুব রেগে গেল। ঝুমা চিরদিনই এমন, ও এত সপ্রতিভ যে সবসময়ই বাবলি ওর কাছে এলেই হীনমন্য বোধ করেছে। কোনোদিক দিয়েই বাবলি ঝুমার যোগ্য যে নয় সেকথা বাবলি জানে বলেই, ঝুমাকে ও কখনই তেমন সহ্য করতে পারে নি। আজ যখন ঝুমা তার জীবনের একটা অন্যতম প্রধান প্রাপ্তির পথে দাবিদার হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন ঝুমাকে সহ্য করা ওর পক্ষে সত্যিই মুশকিল।

ঝুমার হোটেলের সামনে গাড়ি থামিয়ে অনেক পীড়াপীড়ি করল অভী ওদের সঙ্গে যেতে। কিন্তু ঝুমা তেমনি হেসে হেসেই নেমে গেল।

বাবলি চুপ করে ছিল।

ঝুমা যাওয়ার সময়, চলি রে বাবলি, বলে চলে গেল দৌড়ে।

মাঝ-পথে হোটেলের বারান্দায় ফিরে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলল, হ্যাভ আ নাইস টাইম।

বাবলি একটা সংক্ষিপ্ত, থ্যাঙ্ক ট্যু! বলল উত্তরে।

অভী চেঁচিয়ে বলল, দুপুরে খাওয়ার পর আসছি কিন্তু। দুটোর সময়! লক্‌টাক্‌ লেকে যাব। রেডি হয়ে থাকবে।

বাদবাকী পথটা কোনো কথা বলল না অভী বাবলির সঙ্গে।

ওর বাড়ির কাছাকাছি এসে অভী বলল, আমার মনে হয় ঝুমাকে নিয়ে আমাদের মধ্যে খুব বড় ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যাচ্ছে। ঝুমার কথা তুমি আমাকে দিল্লিতে বলেছিলে। এখানে ফিরে আসার পর ও প্রত্যেকবারই এখানে এলে আমাকে ফোন

করত। মাঝে একবার দুদিন থেকে গেছিলও ছুটি নিয়ে। ও আমার বন্ধুর বোন। তাই ওকে আমি তুমি বলি। ও প্রথমদিন থেকেই আমাকে 'অভীদা' 'তুমি' বলে ডাকে। খুব প্রাণ আছে ওর মধ্যে। আমি ওকে পছন্দ করি, কিন্তু সেই পছন্দ করার সঙ্গে তোমাকে পছন্দ করার তফাৎ আছে অনেক।

ওকে আমি প্রথমদিনই তোমার কথা বলি। তোমার পরিচয় শুনেই ও বলেছিল যে, তুমি ওর ছোটবেলার বন্ধু। তুমি পুজোর ছুটি কাটাতে এখানে আসছ শুনে ও বলল, আমি বাবলি আসার একদিন আগেই আসব। ওকে চমকে দেব। খুব মজা হবে। তাহলে পুজোটা আমিও এখানে কাটাব।

গাড়িটা ওর কম্পাউন্ডে ঢোকাতে ঢোকাতে অভী বলল, সত্যি বলছি, এই ইনোসেন্ট ব্যাপারটাকে যে তুমি এত সিরিয়াস্‌লি নেবে তা আমি ভাবতে পারি নি। ও যখন এসে পড়েছে, বলতে গেলে আমারই নিমন্ত্রণে, তখন ওকে হোটেলে থাকতে দেওয়া বা এখান থেকে চলে যেতে বলা কি ঠিক হবে আমার পক্ষে? এখানের হোটেল একা মেয়েদের থাকার পক্ষে নিরাপদও নয়। তাছাড়া, ও তো আমার এবং তোমার সম্পর্কটার কথা ভালোভাবেই জানে। আমি তো ভেবেছিলাম, তোমার বন্ধুকে এখানে পেয়ে তুমি খুশীই হবে। অথচ...

গাড়ি থেকে নামতে নামতে বাবলি বলল, আপনার পক্ষে কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক তা আপনিই স্থির করবেন। এতে আমার মতামতের অবকাশটা কোথায়?

অভী অবাক হল। বলল, ওঃ। যাক্‌গে।

ওরা গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসল।

কুলো সিং চা এনে দিল।

বাবলি চা ঢালতে ঢালতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলল, চা খেয়ে চান করব। আমার ঘর কোনটা?

তার পর বলল, আপনার বাড়িটা ঘুরে দেখি। ব্যাচেলররা খুব নোংরা হয়ে থাকেন বলে শুনেছি। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে তো আপনার বাড়িকে নোংরা বলে মনে হচ্ছে না।

অভী বলল, ইন্সপেক্ট করে তারপরই সার্টিফিকেট দিও। তুমি কি স্যানিটারী ইন্সপেক্টর?

বাবলি হাসল। তারপর বলল, এখানে আমাদের কি প্রোগ্রাম?

অভী বলল, পাঁচদিনের ট্যুরে যতখানি ভালো প্রোগ্রাম করা যায় তাই-ই করেছি।

আজ দুপুরের খাওয়ার পর লকটাক্ লেকে যাব। লক্‌টাকের বাংলোয় রাত কাটাব। কাল সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে ফিরে আসব ইম্ফলে। দুপুরে রেস্ট করে

বিকেলে তোমাকে কবরখানা দেখাতে নিয়ে যাব। এখানের কবরখানার এপিটাফ্‌গুলোতে যে-সব লেখা আছে, তা পড়লে চোখে জল পড়বে।

বাবলি বলল, চোখ দিয়ে জল পড়ার যথেষ্ট কারণ জীবনে এমনিতেই অনেক আছে। আমি কবরখানা মোটেই দেখতে রাজী নই। আপনি এত কবরখানার ভক্ত কেন বলতে পারেন? কোহিমাতে গিয়েও তো প্রথমেই কবরখানায় নিয়ে গেছিলেন।

—তাহলে যাব না। অভী বলল।

—তারপর? বাবলি শুধোল।

—তারপর কবরখানা না দেখতে চাইলে—এমনিই এদিক ওদিক ড্রাইভে যাব, রাতে পুং-চোলোম্‌ আর থৈবী-থাম্বার নাচের প্রোগ্রাম। আশা করি ভালো লাগবে তোমার। তার পরদিন খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ব। বর্মার সীমান্তের দিকে।

—কতদূর ইম্ফল থেকে? বাবলি শুধোল।

—অনেক দূর। সারাদিনের না হলেও প্রায় একবেলার ড্রাইভ। প্যালেলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর চেকপোস্ট পার হয়ে যেতে হবে 'মোরে'তে। 'মোরে' ভারতের শেষ গ্রাম। পথে পড়বে টেংনোপাল। খুব উঁচু পাহাড়। প্রায় কার্সিয়াং-এর মতো উঁচু। সবসময় কুয়াশা-ঘেরা থাকে। সারা রাস্তাটাই পাহাড়ের আর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।

—আমরা রাতে কোথায় থাকব? বাবলি শুধোল খুশি খুশি গলায়।

অভী বলল, 'মোরে'র বাংলোতে। সুন্দর বাংলো আছে দুটো। ছোট বাংলোটাই বেশি সুন্দর। কিন্তু বড় বাংলোটা না হলে আমার, তোমার ও ঝুমার থাকার অসুবিধে হবে।

বাবলির ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল।

কথা বলল না কোনো।

অভী নিজেই বলে চলল, 'মোরে'তে তো থাকব রাতে—কিন্তু তার আগে তোমাকে বার্মাতেও ঘুরিয়ে আনব। মোরের ওপাশে বার্মিজ গ্রাম "তামু"। নো-ম্যান্‌স ল্যান্ড পেরিয়ে। সেখানে প্যাগোডা আছে—দেখাব। হাটে "খাউসুয়ে" খাওয়াব—বার্মিজ নুডলস। দারুণ খেতে। বার্মিজ ছাতা, তানাখা, লুঙ্গি এসব কিনতে পার ইচ্ছা করলে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, চলই না। দেখবে কী ভালো লাগে। সারাদিন টো-টো করে তারপর রাতে এসে বাংলোয় থাকব। রাতে তোমাদের কি কি খাওয়াব তার মেনু পর্যন্ত ঠিক করে আগে থাকতে পাঠিয়ে দিয়েছি আমি। কোনো কষ্টই হবে না তোমাদের।

—বুঝতেই পারছি। সংক্ষিপ্তভাবে ঠাট্টার গলায় বলল বাবলি। তারপরই বলল, তুলিহালে নেমে অবধি বুঝতে পারছি যে, হবে না।

বলেই বাবলি অপ্রস্তুত অভীর মুখে তাকিয়ে হাসল, ওকে আশ্বাস দেবার জন্যে।

তারপর বলল, এবার উঠুন মশায়। আমায় ঘর দেখান। চান করব।

বাবলি চান করার কথা বলতেই অভীর সারা শরীর শিরশির করে উঠল।

বাবলিকে চিঠি লিখতে লিখতে, বাবলির লেখা চিঠি পড়তে পড়তে অভীর ইচ্ছে করেছে অনেকরকম। ভবিষ্যতের কথা অনেকভাবে ভেবেছে অভী। তেমন করে এর আগে আর কখনও ভাবে নি। এমন করে যে ভাবা যায়, সেকথা পর্যন্ত আগে কখনও জানত না অভী।

ও অনেকবার ভেবেছে যে, বাবলিকে ও একদিন নিজে হাতে, কোনো সুগন্ধি সাবানে অনেক ফেনা তুলে চান করাবে।

তাই এই চান-করার কথা উঠতেই সেকথাটা মনে পড়ে গেছিল অভীর।

ঘর দেখে, ওর ঘর-সাজানো দেখে বিলক্ষণ খুশী হল বাবলি। সুন্দর একটা রুচির ছাপ আছে ঘরময়। পাপোশ থেকে বেডকভারে—দেওয়ালের ছবি থেকে টেবিলের ম্যাটস্-এ।

বাবলির ঘর প্রদক্ষিণ শেষ হলেই, অভী দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার দিকে পেছন করে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দুহাত মেলে ধরল বাবলির দিকে।

বলল, দৌড়ে এস। আমার বুকে দৌড়ে এস। আমি অনেকদিন স্বপ্ন দেখেছি যে তুমি দৌড়ে আমার বুকে আসছ।

বাবলি হাসল। দুষ্টু হাসি।

এতক্ষণে বোধহয় ওর মনের আকাশ থেকে ঝুমার ভাবনার মেঘ কেটেছে।

বাবলি বলল, কি করে দৌড়ে আসতে হয় আমি জানি না। আমি অনেক কিছুই জানি না।

অভী রোম্যান্টিক গলায় বলল, আমিও কি জানি নাকি? কাব্য করে বললে বলতে পারি, বোধহয় শ্রাবণের বৃষ্টির মতো। এস, দৌড়ে এস ; ঝম্‌ঝম্ করে এসে আমাকে ঝুপঝুপিয়ে তোমার ভালোবাসায় ভিজিয়ে দাও।

বাবলি তবুও দৌড়ে এল না। ধীরে, নিশ্চিন্তে, আত্মবিশ্বাস-ভরা পদক্ষেপে ভেসে এল অভীর দিকে, তারপর মুখ রাখল অভীর বুকে।

অভী ওর সিঁথিতে, ওর চোখে, ওর চিবুকে, ওর বুকে অনেক অশান্ত, অবাধ্য চুমু খেল অনেকক্ষণ ধরে।

বাবলি ফিসফিস করে বলল, তুমি আমাকে ভালোবাস সত্যি?

অভী থমকে দাঁড়াল।

অবাক হয়ে বলল, মিথ্যা?

তারপর বলল, হঠাৎ এ সন্দেহ? এতদিন পরে? এতকিছুর পরে?

বাবলি আবারও বলল, আমাকেই বাসো? একা আমাকে?

অভী বাবলিকে দুহাতে ওর বুকের মধ্যে পিষে ফেলে বলল, হিংসুটি, মেয়ে মাত্র হিংসুটি!

তারপর বলল, বাসি বাসি, বাসি। তোমাকে, একা তোমাকেই ভালোবাসি।

আর কাউকে না তো? একটুও না? বাবলি ভুরু তুলে বলল।

অভী ওর ঠোঁট বন্ধ করে দিল চুমোর শীলমোহরে।

খেতে বসে অভী একবার ঝুমার প্রসঙ্গ তুলেছিল।

বলেছিল, এ কাজটা কিন্তু ভালো হল না। বেচারী ঝুমাকে কিন্তু আমি বলে রেখেছিলাম যে তুমি এলেই ওকে বাড়িতে আনব হোটেল থেকে। তুমি ওর বন্ধু জানতাম। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে সদ্ভাব নেই একথা জানতাম না।

বাবলি ছুরি দিয়ে ফল কাটতে কাটতে বলল, ও আমার বন্ধু এবং কিরকম বন্ধু সেকথা পরে বলব, কখনও যদি শুনতে চাও, তার আগে তুমি বল, ঝুমা তোমার কি রকম বন্ধু?

—মানে? অবাক হয়ে অভী শুধোল।

—মানে বুঝতে পারলে না? বাবলি বলল।

—না। প্রাঞ্জল করে বল।

অভী গম্ভীর গলায় বলল।

—মানে, তোমার ও ঝুমার বন্ধুত্বের গভীরতা কতখানি? তুমি ঝুমা সম্বন্ধে কতটুকু জান?

—বেশি জানি না। জানতে চাইও নি। তোমার বন্ধু এ জানাটাই তো আমার কাছে অনেকখানি ছিল। তোমার শত্রু যে, সেকথা আগে জানলে আরো বেশি জানার চেষ্টা করতাম।

বাবলি বলল, তুমি আমাকে ঝুমার সম্বন্ধে লেখো নি তো আগে, একবারও জানাও নি যে ওকে তুমি এমনভাবে নেমন্তন্ন করে এনেছ এখানে। তা জানলে আমি এখানে আসতাম না।

এবার অভীর স্বর আর তরল রইল না।

অভী বলল, দ্যাখ বাবলি, তুমি বোধহয় বাড়াবাড়ি করছ।

বাবলি বলল, না। আমি বাড়াবাড়ি করছি না।

—তাহলে তুমি কি চাও যে ঝুমাকে আমি চলে যেতে বলি ইম্ফল থেকে?

—তুমি বলবে কেন? ওর আত্মসম্মান থাকলে ও নিজেই চলে যাবে। কিন্তু আমি জানি যে, ওর আত্মসম্মান নেই। ওকে না তাড়ালে, ও যাবে না।

অভী অসহায়ের ভঙ্গীতে চেয়ারে গা-এলিয়ে দিয়ে বলল, তাহলে একথা ওকে এক্ষুনি বলা দরকার। তুমি রেস্ট করো, আমি ওর হোটেলে যাচ্ছি।

—না। তুমি যাবে না। বাবলি বলল।

অভী একটু বিরক্ত হল বলে মনে হল।

বলল, দ্যাখ বাবলি, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড মি! তোমার সঙ্গে ঝুমার কি কারণে ঝগড়া তা আমি জানি না, কিসের তোমাদের শত্রুতা তাও জানি না। কিন্তু তার জন্যে আমি কেন নিজেকে ওর কাছে ছোট করতে যাব? ও তো আমার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করে নি। এবং একথাও সত্যি যে, ও যতবার এর মধ্যে ইম্ফলে এসেছে গেছে সে সময়ে তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা হয়েছে আমাদের, কিন্তু ও বরাবর তোমার প্রশংসাই করেছে। তোমাকে ভালোই বলেছে, আমাকে বলেছে, আমি খুব লাকি যে তোমার মতো মেয়ের ভালোবাসা পেয়েছি। অথচ তুমি আসতে-না আসতেই ওর সঙ্গে যে ব্যবহার করছ, ওর সম্বন্ধে যা-যা বলছ তা কিন্তু একেবারে অন্যরকম। আমি যদি পুরোপুরি মেনেও নি যে, তুমি যা বলছ তার সবই ঠিক ; তবুও ওর সঙ্গে আমার খারাপ ব্যবহার করাটা কি ভদ্রতার হবে?

বাবলি একরোখা গলায় বলল, আমি অত জানি না। আমি যা বলছি তা তোমাকে করতে হবে। তোমার এখন ওখানে যাওয়া চলবে না। গেলে দুজনে একসঙ্গেই যাব। যখন যাবে বলেছ, তখন, ওকে তুলতে। তার আগে নয়!

অভী চেয়ার ছেড়ে উঠে, একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল।

—কি জানি? আমি তোমাকে বুঝতে পারছি না।

—পারবে। আজ না পারলেও একদিন পারবে।

বাবলি বলল।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, ফল কেটে রেখে অথচ না-খেয়ে বাবলি চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দায় গিয়ে বসল।

অভীর বাংলোর সামনেই বড় রাস্তা। ব্রিটিশ আমলে লাগানো বড় বড় মহীরূহ পথের দুপাশে। কেসিয়া ভ্যারাইটির রেইনট্রি। পথটাকে ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে সব সময়। মাঝে মাঝে গাড়ি যাচ্ছে দু-একটা। জীপ ও ট্রাক যাচ্ছে সেনাবাহিনীর। কতগুলো দাঁড়কাক কাঠের গেটের উপরে বসে কর্কশ গলায় ডাকছে কা-কা করে।

অভী বারান্দায় এসে চেয়ার টেনে বসল।

ওর মুখ দেখে মনে হল যে অভী খুব অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়েছে। বাবলির সঙ্গে ওর সম্পর্কটা এতখানি পুরোনো নয় যে অকপটে ঝগড়া করতে পারে, আবার এমন নতুনও নয় যে ফর্মালিটি করে নিজের মনের ভাব বুকের গভীরে নিঃশ্বাস চাপা দিয়ে রাখে। কি যে করা উচিত ; বুঝতে পারছিল না অভী।

হঠাৎ বাবলি চাপা-গলায় বেঁকা চোখে চেয়ে বলল, ঝুমাকে তোমার সুন্দরী বলে মনে হয় না?

অভী অবাক হল। অবাক হয়ে অনেকক্ষণ বাবলির চোখে তাকাল।

তারপর বলল, নিশ্চয়ই।

—ঝুমার ব্যবহার ভালো লাগে না?

—খু-উ-ব! অভী আবার বলল, অন্যদিকে তাকিয়ে।

—সব মিলিয়ে ওকে তোমার ভালো লাগে নি?

—হ্যাঁ। তাও লেগেছে। ভালো লেগেছে বই কি!

—তাহলে আর সত্যি কথাটা আমার কাছে লুকানো কেন? তুমি ঝুমাকে নিয়ে এখানে এস। আমি ঝুমার হোটেলে যাচ্ছি। কাল সকালের ফ্লাইটে আমি চলে যাব।

অভী উত্তেজিত হয়ে উঠল বলে মনে হল ওর চোখ দেখে।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, দ্যাখ, ভালো লাগলেই যে সব ভালো লাগা একরকম হবে তার কোনো মানে নেই। আমার সঙ্গে ঝুমার যে সম্পর্ক, সে সম্পর্কের সঙ্গে তোমার আমার সম্পর্কের কোনোই মিল নেই। এ দুই সম্পর্ক একেবারেই আলাদা আলাদা। কাউকে ভালো লাগলেই যে ভালোবাসতে হবে, বা বিয়ে করতে হবে তার কোনো মানে নেই। তাছাড়া, ঝুমার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার অনেক পরে। তোমার বান্ধবী বলেই সে আলাপ হয়তো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তুমি যে পুরো ব্যাপারটার এমন কদর্থ করবে, তা আমি ভাবতেও পারি নি।

বাবলি রেগে উঠে প্রায় কেঁদে ফেলল।

বলল, তুমি কি জান, ঝুমা তার ব্যাগে তোমার সুইমিং-ট্রাঙ্ক পরা ছবি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কতদিন হল? তুমি জান কি যে, ও কত ছেলের মাথা চিবিয়ে খেয়েছে? কত ছেলে আত্মহত্যা করেছে ওর জন্যে? ওর মুখশ্রী আর ওর অভিনয় দিয়ে ও কত ঘর ভেঙেছে?

তারপর একটু চুপ করে থেকে হতাশ গলায় বলল, তুমি ওর সম্বন্ধে কিছুই জান না। তুমি জান না ও কত নীচ, ইতর ; কত কুচক্রী। ও আমার কত বড় সর্বনাশ করার জন্য এখানে এসেছে।

অভী চেয়ারে সোজা হয়ে বসল।

বলল, দারুণ ইন্টারেস্টিং সব ব্যাপার। ঝুমা যে এত গুণী মেয়ে আমি জানতাম না তো! নিজেকে, নিজের গুণাবলীকে লুকিয়ে রাখার আশ্চর্য ক্ষমতা যে ও রাখে, তা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। রিয়্যালি ভেরী ভেরী ইন্টারেস্টিং। আমি ভাবতাম, আমার জীবনে তুমিই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং মেয়ে। কিন্তু ঝুমা যে তোমার চেয়ে আরো অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং—তা আমার জানা ছিল না। ইট্স স্ট্রেঞ্জ—রিয়্যালি স্ট্রেঞ্জ!

—তার মানে? বাবলি বলল।

অভী বলল, মানে নেই। সব কথার মানে হয় না।

নয়

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর একটু জিরিয়ে নিয়ে যখন অভী আর বাবলি ঝুমার হোটেলে এল, তখন ম্যানেজার বললেন যে, ঝুমা খুব জরুরি কাজে নাকি বেরিয়ে গেছে। একটা চিঠি দিয়ে গেছে ওঁর কাছে।

ম্যানেজার অভীর হাতে চিঠিটা দিলেন, কিন্তু বাবলি চিঠিটা ছোঁ মেরে অভীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে খুলল।

অভী অবাক-হওয়া মুখে তাকাল আড়চোখে বাবলির দিকে।

বাবলি চিঠিটা নিজে একবার মনে মনে পড়ল।

তারপর জোরে জোরে অভীকে পড়ে শোনাল।

মণিপুর হোটেল

অভীদা,

এক বিশেষ ব্যক্তিগত কাজে একটু বেরোতে হচ্ছে আমায়। তোমাদের সঙ্গে লক্টাকে যাওয়া হবে না। তোমরা লক্টাক থেকে ফিরে এলে আশা করি কাল সকালে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

কিছু মনে করো না। হ্যাভ্ আ নাইস টাইম। ইতি—

ঝুমা।

পুনশ্চ ঃ বাবলি, তোকে আলাদা করে লিখলাম না। আশা করি বুঝবি।

অভী ভালো করে চিঠিটার মানে হৃদয়ঙ্গম করার আগেই বাবলি বলল, ছিঁড়ে ফেলব?

অভী চমকে উঠল।

অন্যমনস্ক ছিল ও।

বলল, যা খুশি।

বাবলি বিনা বাক্যব্যয়ে চিঠিটা কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে বলল, চল, এবার তোমার লক্‌টাক্ না কোথায়? ঝুমা যখন যাবেই না তখন আর কি করা যাবে?

অভী স্বগতোক্তির মতো বলল, চল।

বলেই, হোটেলের অন্য পাশের গেট দিয়ে গাড়ি বের করল।

অনেকক্ষণ অভী কোনো কথা বলে নি।

বাবলি বলল, এমন রামগরুড়ের ছানা হয়ে থাকবেন বলেই কি আমাকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছিলেন?

অভী হাসল।

তারপর বলল, তোমার এই সম্বোধনের কায়দাটা বেশ। কথার ভাব অনুযায়ী কখনও "তুমি" কখনও "আপনি"। এই গুরুচণ্ডালি ব্যাপারটা আমার পছন্দ নয়।

বাবলিও হাসল।

বলল, বেশ। এবার থেকে চণ্ডালের ভাষাই ব্যবহৃত হবে।

গাড়ি চলছিল হু হু করে। উপত্যকাটার চারিদিকে মাথা উঁচু পাহাড়। মিজো পাহাড়, নাগা পাহাড়। শরতের রোদ লুটিয়ে আছে পাকা ধানের ক্ষেতে। বাতাসে ফসলের গন্ধ, রোদে অভ্র কুচির ঔজ্জ্বল্য—মিষ্টি মিষ্টি ঠাণ্ডা।

অভীর পাশে, গায়ের পাতলা চাদরটা টেনে-টুনে জড়িয়ে বসে, বাঁ-হাতটা জানালায় রেখে বাবলি অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে চলেছে।

যে-স্বপ্ন কৈশোরে পা দেওয়ার পর থেকে সব মেয়েই দেখে, বাবলির জীবনের সেই স্বপ্ন সত্যি হওয়ার ঝিম্ ধরা আনন্দে বুঁদ হয়ে বসে আছে।

কত মাইল পথ ওরা এসেছে জানে না বাবলি।

সারা পথ, মাঝে মাঝেই বাবলি আদুরে কাকাতুয়ার মতো কিছু একটা বলে উঠেছে, অভী হুঁ-হাঁ করে জবাব দিয়েছে। স্টীয়ারিং-এ বসা অবস্থায় রাস্তার দিকে নজর রেখেছে বরাবর।

হঠাৎ বাবলি বলল, আমি একটু গাড়ি চালাব। কী সুন্দর রাস্তা!

অভী নিরুত্তাপ গলায় বলল, বেশ তো!

বলেই, পথের বাঁ-দিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দরজা খুলে বাবলির জায়গায় এল বাঁ-দিকে।

বাবলি গিয়ে স্টীয়ারিং-এ বসল।

আসলে অভীর মনের মধ্যে তখন অনেক কিছু ভাঙচুর হচ্ছিল।

অভী ভাবছিল, প্রত্যেক মানুষের মনই বুঝি ল্যাবরেটরীর ক্রুসিবল-এর মতো। তাতে নানা মনজ রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে—কত কিছু মিশ্র অনুভূতি—তার মধ্যে কত কিছু সত্য প্রমাণিত হয়, কত মিথ্যা অপ্রমাণিত হয়।

অভী ভাবছিল, মানুষের মনের মতো দুর্জয় জিনিস পৃথিবীতে বুঝি আর কিছুই নেই।

আজ সকালে এয়ারপোর্টে যাবার আগে পর্যন্ত ও জানত, বিশ্বাস করত যে, ভালোবাসার প্রকৃতি বুঝি একই রকম। তার চেহারা সরলরেখারই মতো। নিজের মনের এক গোপন কেন্দ্র থেকে অন্য মনের কেন্দ্রে সে রেখা সোজাই বুঝি পৌঁছয়। এ পথে যে এত চড়াই-উৎরাই বাধা-বিপত্তি ; ও কখনও জানত না।

ঝুমাকে তার ভালো লাগত। সেই ভালোলাগায় কোনোমাত্র খুঁত ছিল না। কিন্তু সে ভালোলাগা একটা ওয়াটার-টাইট ভালোলাগাই ছিল। তার মধ্যে ভালোবাসার কোনোরকম আর্দ্রতাই চুঁইয়ে আসে নি। কিন্তু আজ সকাল থেকে বাবলির এই আশ্চর্য ব্যবহার, বিশেষ করে ঝুমার প্রতি, এবং কিছুটা অভীর প্রতিও ; ঝুমা সম্বন্ধে অভীকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। বাবলি সম্বন্ধেও।

ঝুমাকে ও একজন সুন্দরী, দারুণ স্মার্ট, চমৎকার কন্‌ভারসেশানিস্ট্ সঙ্গিনী হিসেবেই চেয়েছে। একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দারুণ বোন হিসেবে। ঝুমার দিক থেকেও দাদার বন্ধুসুলভ যে ব্যবহার ও পেয়েছে তাতে একবারের জন্যেও ওর মনে সন্দেহ হয় নি যে, ঝুমার মনে তার জন্যে বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি আছে, অথবা থাকতে পারে। কিন্তু ঝুমার বাবলির হাতে এইরকম করে দুঃখ পাওয়া দেখে অভীর বারবার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেছে। ও যখন স্কুলে পড়ে তখন ও একটা সুন্দর ছটফটে সাদা পায়রাকে ধরেছিল ছাদের আল্‌সে থেকে—তারপর রাতে নিজের শোবার ঘরের মেঝেতে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছিল সোহাগ করে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দ্যাখে তারই আদরের বেড়ালটা সেই পায়রাটার ছিন্ন-ভিন্ন রক্তাক্ত পালক ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রাখে নি। অভী না-পেরেছে তার সুন্দর ভালোলাগার পায়রাটাকে বাঁচাতে, না-পেরেছে তার আদরের বেড়ালটাকে লাঠি পেটা করতে। কিন্তু মনে মনে সে তার পোষা বেড়ালটার প্রতি এক দারুণ স্তব্ধ অভিমানে নিরুপায় নীরবতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে থেকেছে।

আজকে বহু বছর পরে অভীর মনে সেই ছোটবেলার ভাবনাভরা নিরুপায় অভিমান আবার যেন বুকময় ফিরে এসেছে। ও কি করবে, কি ওর করা উচিত, অভী কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না।

সামনে লক্‌টাক লেকের জল দেখা যাচ্ছে। বেলা পড়ে এসেছে। শেষ সূর্যের

আলো ঝিকমিক করছে জলে। লেকের ওপারে নাগা পাহাড়ের পুঞ্জীভূত অবয়ব এক অতিকায় রোমশ প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো আকাশে মাথা-ছোঁওয়ানো উঁচু পিঠে রোদ পোয়াচ্ছে যেন। মিজো পাহাড়গুলোকেও দল-বাঁধা ডাইনোসরের পিঠ বলে মনে হচ্ছে।

অভী ওদিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল আবার।

ও ভাবছিল, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ হলে জীবনটা অনেক ঝামেলা বিবর্জিত হত। সারাদিন পশুচর্ম গায়ে জড়িয়ে পাথরের মুগুর হাতে ঘুরে-ফিরে সন্ধ্যাবেলায় গুহায় ফিরে একটু কাঁচা মাংস ঝল্‌সে খেয়ে নারী-শরীর নামক এক জৈবিক আচারের রসাস্বাদন করে কী সরল সোজা সুখে জীবনটা কাটাতে পারত। যত দিন গেছে, মানুষ যত সভ্য হয়েছে, তার বুকের মধ্যের বায়বীয় সত্তার মন নামক ইনট্যানজিবল ব্যাপারটা দিনে দিনে ক্রমশই জটিল হয়ে উঠেছে। আজকের দিনের অভীর মতো শিক্ষিত মার্জিত মানুষ তার পারিপার্শ্বিকের অনেক কিছু জেনে ফেলেও, চাঁদে পদক্ষেপ করেও, নিজের থেকে দূরে, আরও দূরেই শুধু সরে গেছে। বাইরের পৃথিবীকে আপন করেছে, কাছে টেনেছে ; কিন্তু ধীরে ধীরে নিজের বুকের মধ্যের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন যোগাযোগহীন দুস্তর ব্যবধানের বিন্দু বিন্দু দ্বীপের মতো হয়ে উঠেছে অনবধানে। এখন মানুষ লক্ষযোজন দূরের কথা মুহূর্তে শুনতে পায় নিজের ইচ্ছায় চাবি টিপে ; পায় না শুধু নিজের বুকের শব্দ শুনতে ; তাকে বুঝতে।

হঠাৎ বাবলি বলল, ঐ পিলারটা কিসের?

স্বপ্নোত্থিতের মতো অভী বলল, এটাই তো নেতাজী মেমোরিয়াল। আই এন-এ ফৌজের সঙ্গে এইখানে ব্রিটিশ সেনাদের যুদ্ধ হয়েছিল। সামনে যে ছোট্ট বাড়িটা দেখছ, ওটার মধ্যে নথিপত্র রাখা আছে, চল দেখবে।

বাবলি গাড়িটা থামিয়ে, গাড়ি থেকে নামল।

বাঁ দিকে একটা টিনের চালাঘর। ডানদিকে পাকা ইমারত। চালাঘরটার মরচে-পড়া টিনের ছাদ মেশিনগানের ও স্টেনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে রয়েছে।

অভী বলল, দেখেছ? গুলির দাগ! এখনও স্পষ্ট।

ওরা আই-এন-এ মেমোরিয়াল দেখে যখন বেরুল তখন সন্ধ্যে হব হব।

কিছুদূর গাড়ি চালিয়েই ওরা লক্‌টাক্ লেকের উপরের ছবির মতো সুন্দর বাংলোয় এসে পৌঁছল।

উঃ, কী দারুণ!

বাবলি স্বগতোক্তি করল।

বলল, গতবার মেসোমশাই এখানে যে কেন নিয়ে আসেন নি, জানি না।

অভী বলল, কি জানি?

বাবলি বলল, অনেকক্ষণ থেকে আপনার মুড অফ্ দেখছি। আমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে না করলে, বলবেন না।

অভী হাসল। বলল, বাঃ, তা কেন? কি যে বলো?

বাবলিরও নিজেকে অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করছিল। ও যে এই ইম্ফলে এসে কী মুশকিলেই পড়ল, তা বলার নয়।

অভী বলল, বাংলোটা সত্যিই সুন্দর। এখানে তোমাকে নিয়ে আসব অনেকদিন থেকে তা ঠিক করে রেখেছিলাম। আজ সত্যিই আসা হল। তোমার যে ভালো লেগেছে তাতেই আমি খুশি।

বাবলি বলল, জলের মধ্যে মধ্যে ঐ যে আলোগুলো জ্বলছে ওগুলো কিসের আলো?

অভী বাংলোর বারান্দায় ফিরে দাঁড়িয়ে লেকের দিকে তাকাল।

তখন পাহাড় পেরিয়ে শেষ বেলার ম্লান লালিমা আধো অন্ধকারে বিস্তৃত সীসে রঙা গালচের মতো লক্টাক্ হ্রদের উপর ছড়িয়ে পড়েছে।

ও একটু চুপ করে থেকে বলল, এগুলো দারুণ ব্যাপার। হ্রদের মধ্যে কচুরিপানার মতো একরকমের পানা হয়। সেই পানাগুলো ছোট ছোট ভাসমান দ্বীপের মতো ভেসে বেড়ায়, হ্রদের বুকে। এই পানার দ্বীপে পাতার ঘর বাঁধে জেলেরা, মাছ ধরে, আফ্রিকান ক্যানোর মতো ছোট ছোট নৌকায়—মাছ জমা করে দ্বীপের উপর—তার উপরেই রাঁধে-বাড়ে ভেসে ভেসে, ঐখানেই খায়-দায়। ক্লান্ত হলে ঘুমোয়।

তারপর থেমে বলল, একটু চুপ করে থাক, একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাবে?

বাবলি চুপ করে রইল।

সত্যিই শুনতে পেল অদ্ভুত একটা গম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসছে হ্রদের মধ্যে থেকে, বাংলোর চতুর্দিক থেকে। শব্দটা অনেকটা ডুং ডুং-ডিং ডিং মতো। কিন্তু ধাতব শব্দ নয়। শব্দটা ভোঁতা। এবং একটা শব্দ নয়, অনেকগুলো শব্দ। সবদিক থেকে আসছে। ভোঁতা বলে, এবং জলের গা বেয়ে আসছে বলে খুব ভারী বলে মনে হচ্ছে শব্দগুলোকে। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই ডুং-ডিং শব্দ বাবলির মনে কি এক অনামা-অজানা-অনিশ্চিত, ভয়ের সঞ্চার করল।

বাবলি অভীর বাহুর কাছে ঘন হয়ে এসে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে শুধোল, এ কিসের শব্দ।

অভী হেসে উঠল।

অনেক, অনেকক্ষণ ধরে হাসল অভী। বাবলি ভাবল। অনেকক্ষণের গুমোট কাটল। এই বাংলোর দেওয়ালে-দেওয়ালে অভীর হাসিটা যেন অনেক লোকের হাসি হয়ে গম্‌গম্‌ করে উঠল ঘরময়।

অভী বলল, জেলেরা তাদের মাছ-ধরা নৌকোর উপরে বৈঠা দিয়ে আওয়াজ করছে। যাতে মাছেরা দৌড়াদৌড়ি করে। মাছেরা ভয় পেয়ে দৌড়াদৌড়ি করলে তারা সহজে জেলেদের পেতে-রাখা জালে গিয়ে পড়বে।

বাবলি তখনও আচ্ছন্ন হয়ে ছিল।

অস্ফুটে বলল, কী অদ্ভুত শব্দ!

অভী হ্রদের বুকে হাওয়ায় কাঁপা ভৌতিক আলোগুলোর দিকে চেয়ে বলল, আমি পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছি, এমন অদ্ভুত শব্দ কখনও শুনি নি।

বাবলি বলল, আমি তোমার মতো দেশ ঘুরি নি কিন্তু এমন শব্দ আমিও কখনও শুনি নি। শব্দটা ভীষণ ভয়ের। শিরদাঁড়া ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

অভী বলল, আমার পাশে দাঁড়িয়েও? সেটা আমার পক্ষে ইনসাল্‌টিং।

বাবলি আদুরে গলায় বলল, উঁ-ম্‌-ম্‌-ম্‌-ম্‌।

ডাকবাংলোর বসার ঘরে অন্ধকার নেমে এসেছিল।

বাবলি বলল, আলোটা জ্বেলে দাও না। আমার বড় ভয় করছে।

অভী আলো জ্বালতে গেল। কট্‌ করে শব্দ হল সুইচের। বলল, লোডশেডিং।

ও মা! তবে কি হবে?

ভয়ার্ত গলায় বলল বাবলি।

বাবলির কথা শেষ হতে-না-হতে চৌকিদার একটা বড় কেরোসিনের সেজবাতি নিয়ে ঘরে ঢুকল। তার দুহাতে-ধরা বাতির আলোয় দেওয়ালে তার ছায়া পড়েছিল। লোকটার ছায়াটা কদাকার, ভয়াবহ। লোকটাও।

আলোটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখার পরই ঘরের অন্ধকার যেন অনেক বেড়ে গেল। আলোটা চৌকিদারের মুখে পড়ল। এরকম একটা মুখ এর আগে কখনও দেখে নি বাবলি। মুখটা বড় নিষ্ঠুর কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক। তবু মুখটা কি রকম যে, তা বাবলি প্রথমে বুঝে উঠতে পারল না। মানে, ব্যাখ্যা করতে পারল না।

তারপরই বাবলির মনে হল, যেন বুঝতে পেরেছে। লোকটার মুখে এমন একটা ভাব আছে যে মনে হয় লোকটার সঙ্গে কোনোরকম কম্যুনিকেশানই সম্ভব নয়। লোকটা এই পানার দ্বীপের মতো একটা দ্বীপ। বিচ্ছিন্ন। তার চারধারে যোগাযোগহীনতার জল।

লোকটা কথা বলল অভীকে উদ্দেশ্য করে।

কি ভাষায় বলল, বাবলি বুঝল না।

লোকটার মুখে কথা বলার সময় কোনোরকম অভিব্যক্তি ফুটে উঠল না।

অভী জবাবে অজানা ভাষায় কি সব বলল।

লোকটা নমস্কার করল না। হাসল না।

বাবলির মনে হল, লোকটা ভীষণ দুর্বিনয়ী ভূতুড়ে। হয়তো এইরকম ডুং-ডিং আওয়াজ শুনে শুনে হ্রদের জলের উপর রাতের পর রাত একা একা ভৌতিক আলো জ্বলা দেখে দেখে লোকটাও বোধহয় একরকম অস্বাভাবিক হয়ে গেছে।

অভী বলল, তোমার একটু অসুবিধে হবে একে নিয়ে, এ মিজো। মিজো ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানে না ও। তোমার যা কিছু দরকার আমায় বোলো।

হতাশ গলায় বাবলি বলল, বেশ!

অভী বলল, চান করবে তো?

বাবলি বলল, করতে পারি, যদি জল গরম থাকে।

—জল গরম করে দেবে। লোক তো আছে।

—তা আছে। বাবলি বলল, কিন্তু তাকে তো আমার ভাষা বোঝাতে পারব না।

—আমাকে তো পারবে। অভী সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল।

বাবলি উত্তর দিল না। অভীর দিকে চেয়ে রইল।

অভী ঘরের বাইরে গেল। বোধহয় লোকটাকে ডাকতে।

বাবলির একা ঘরে ঐ ভূতুড়ে পরিবেশে বসে বড় গা-ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল। বাইরে হ্রদের উপরে সেই আওয়াজগুলো ধীরে ধীরে যেন জোর হতে লাগল। নৌকোগুলোর অন্ধকারতর ছায়া অন্ধকার জলের উপর প্রাগৈতিহাসিক কোনো জলচর জীবের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল। ভাসমান ভূতুড়ে দ্বীপগুলোর মধ্যে-মধ্যে কতকগুলো জ্বলে-ওঠা নিভে-যাওয়া আলোর দিকে তাকিয়ে বাবলির মনে হল ও যেন শার্লক হোম্‌সের কোনো নবতম অ্যাডভেঞ্চারের পটভূমিতে এসে পৌঁছেছে।

অভী আসতে দেরি করছে।

বাবলি ওর মনটাকে ঐ জলজ ভয়াবহ আবহাওয়া থেকে তুলে এনে সাহসের তোয়ালে দিয়ে মুছে নিল। তারপর খুশী খুশী চোখ তুলে নিজের মনের দিকে চেয়ে আদুরে নীরবতায় শুধোল, তোমার চান করা না-করা নিয়ে অভীর এত মাথাব্যথা কেন? অভী কি আজ তোমাকে শারীরিকভাবে চায়?

একথাটা ভাবতেই বাবলির কানের লতিতে, গালে, বুকের মধ্যে রক্ত যেন দাপাদাপি করে উঠল। বাবলির সমস্ত বাবলি ছলাৎ করে চলকে উঠল মনের গভীর গোপন অন্তঃপুরে।

শরীরের শরিক এর আগে কেউ হয় নি বাবলির।

ও উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ওর স্বাভাবিক সংস্কারজাত কিছু মানা ছিল। আসলে এ বিষয় নিয়ে এর আগে ও বিশেষ ভাবে নি। বিয়ের আগে একথা ভাবার অবকাশ যে ঘটবে, সেকথাও ভাবে নি। তবে বাবলি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা। বিয়ের আগে শরীরের ভাগীদার কেউ হলেই যে তার চারিত্রিক পতন হল একথা ও কখনও মানে নি। কারণ চরিত্রের ব্যাখ্যা তার কাছে যা, তার সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের চরিত্রের ব্যাখ্যা মেলে না। কারো সঙ্গে স্বেচ্ছায়, স্বাধিকারে ও আনন্দে শরীরের আনন্দ ভাগ করে নিলেই যে নৈতিক অধঃপতন ঘটে তা বাবলি আরো অনেকানেক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা মেয়ের মতই মেনে নিতে রাজী নয়। এও ও ভাবে না, বা বলে না যে, বিবাহ-পূর্ব শারীরিক সংসর্গের মধ্যে কোনো বাহাদুরি বা আধুনিকতা আছে। জীবনে যা সহজ, স্বাভাবিক আন্তরিকতা ও রুচিশীলতার মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় বা দেওয়া যায় তার কিছুমাত্র পেতে বা দিতে কখনও বাবলির দ্বিধা বা দৈন্য ছিল না। অভীকে তার ভালো লেগেছে। শুধু যে ভালো লেগেছে তাই-ই নয়, অভীকে সে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে চলেছে অতি শীগ্‌গিরি। তাই আজ এই আশ্চর্য ভৌতিক পরিবেশে অভী তার পুরুষসুলভ অবুঝপনায় যদি বাবলির কাছে কিছু অগ্রিম চায় তাহলে তা না দেওয়াটা অসমীচীন হবে বলে মনে হল বাবলির। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই হুণ্ডি কেটে দেনাপাওনা নথিভুক্ত করতে হবে যে, এমন কথা নেই। হৃদয়ের ক্ষেত্রে তো কখনোই নয়। এ-বাবদে অনেক দাদন দিতে হয়, অনেককে ; অনেকবার। অনেক অগ্রিম দেয় ঋণ ধুলোয় ফেলাও যায়। আবার অনেক জমাও পড়ে প্রাপ্তির ঘরে, সে জমার কোনো ব্যাখ্যা নেই। তার ছোট্ট জীবনে বর্তমানটাকেই বড় দায়ী বলে মনে করে এসেছে বাবলি। বর্তমানকে আঙুরের মতো নিঙড়ে বাঁচতে চেয়েছে ও—ভবিষ্যৎ বা অতীতের জন্যে কণামাত্র হিসেব না করেই।

সত্যি কথা বলতে কি, অনেক মাস আগে নাগাপাহাড়ের উপরে কোহিমা-ডিমাপুরের পথে সেই কাঠুরের ঘরের হঠাৎ-রাতে অভী বাবলির কাছে সংশয়হীনতার সঙ্গে প্রমাণ করেছে যে, সে শুধু শিক্ষিত পুরুষই নয় ; সে অভিজাতও। তার মধ্যে আপস্টার্ট হ্যাংলামি একটুও নেই। অন্য মেয়েরা পুরুষের মধ্যে কোন্ গুণকে সবচেয়ে বড় গুণ বলে মনে করে তা জানে না বাবলি, জানতে চায় না। কিন্তু ওর কাছে যে পুরুষের চরিত্রে ঔদার্য ও সহানুভূতি না থাকে তাকে কোনোমতেই ভালো লাগানো যায় না। সে রাতে অভীকে ও আহ্বান জানিয়েছিল—একজন শীতার্ত, সভ্য, বিব্রত, লজ্জিত সুন্দর পুরুষকে। কিন্তু অভী

বোধহয় রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকা আদপে পছন্দ করে নি। সে রাতে অভীর চরিত্রের একটা বিশেষ দরজা বাবলির কাছে খুলে গেছিল—যে দরজা ও বহু পুরুষের মধ্যেই দেখবে বলে আশা করে না ; করে নি।

ওর ভাবনায় জাল ছিঁড়ে দিয়ে অভি ঘরে ঢুকল। বলল, জল গরম হচ্ছে। চল, তোমার ঘর দেখবে চল।

বাবলি উঠল। কিন্তু 'তোমার ঘর' কথাটাতে বেশ আশ্চর্য হল। এখানেও কি অভী আলাদা ঘরে শুতে চায় নাকি? এক ঘরে শোওয়ার মধ্যে দোষ কি? পাশাপাশি খাটে শুয়ে গল্পও তো করা যেতে পারে? তাছাড়া এই ভূতুড়ে পরিবেশে, এই নির্জনতার মধ্যে ও একা ঘরে শুতেই পারবে না। ভয়েই মরে যাবে।

কিন্তু একথা অভীকে বলবে কি করে? ও যে অভীর সঙ্গে এক ঘরে শুতে চায়—সম্পূর্ণই নিরাপত্তার কারণে হলেও একথা মেয়ে হয়ে ওর পক্ষে কি করে বলা সম্ভব? ও মনে মনে আশা করেছিল যে, এইবারে অন্তত অভী তাকে লজ্জা থেকে বাঁচাবে। আলাদা ঘরে শুয়ে নিজেকে কি ও চরিত্রবান বলে প্রমাণিত করতে চায়? এখনও কি মিড্‌ল ক্লাস মরালিটি কাটিয়ে উঠতে পারল না? একে একধরনের হীনমন্যতা বা বাহাদুরি-প্রবণতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ভালো সাজার ও ভালো ছেলে বলে নাম কেনার এ কি অর্থহীন মূর্খ প্রয়াস? অভীর আত্মবিশ্বাস কি এতই কম? যা তারই একান্ত, যাতে তার সহজ অধিকার তা সে হাত বাড়িয়ে নেবে না কেন? যে-সব পুরুষের মুখে শিশুর মতো খাবার তুলে দিতে হয় তাদের বাবলি প্রাপ্তবয়স্ক বলে মনে করে না। কেড়ে-কুড়ে ফেলে-ছড়ে খাওয়ার মধ্যে একটা দামাল অগোছালো ভাব আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটাই পুরুষের স্বভাব। পুরুষ পুরুষোচিত না হলে ভালো লাগে না। অভীর এই দ্বিধার কথা ভেবে—অবাক হল বাবলি।

ঘরটা ভালো। সবই ভালো। কিন্তু...। ভীষণ ভয় করবে বাবলির।

ঘরে ঢুকে লণ্ঠনটা তুলে ধরে ভালো করে ঘরটা বাবলিকে দেখাল অভী। মুখে বলল, পছন্দ?

বাবলি উত্তর দিল না।

অভী কিছুক্ষণ বাবলির অপ্রতিভ মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলল, কি? ভয় করবে বুঝি?

বাবলি হেসে ফেলল, লজ্জা, আনন্দ, স্বস্তি সব মিলিয়ে দারুণ এক আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল বাবলির মুখ। ভারী সুন্দর দেখাল বাবলিকে।

বাবলি অভীর বাহুতে মাথা ছুঁইয়ে ঘন হয়ে এল অভীর কাছে। হাসল একটু।

বুদ্ধিমান অভী সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল বাবলি কি বলতে চায়।

ও বলল, কোনো ভয় নেই—বলেই নিজের বুকে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, দারোয়ান পাহারা দেবে।

বাবলি হাসল। বলল, শুধুই পাহারা তো?

অভী বলল, শুধুই পাহারা।

তারপর একটু ভেবে বলল, কিন্তু ভাবছি, আমার লোভকে কে পাহারা দেবে?

অসভ্য! বাবলি বলল। বলেই, মুখ ফিরিয়ে নিল।

বাবলি চান করে নিয়েছে গরম জলে। চান করে উঠে একটা লেমন-ইয়েলো ভয়েলের শাড়ি পড়েছে। সঙ্গে ঐ রঙের ছোট হাতার প্লেট-মুড়ে সেলাই করা লো-কাটের ব্লাউজ। অভী চান করতে গেছে। ও সোফায় বসে আছে। আলোটা হঠাৎ জ্বলে উঠল। খুশী হল বাবলি।

খাট দুটো আলাদা আলাদা নয়। একেবারে জোড়া-লাগানো। সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল বাবলি। তারপরই ওর তলপেটে ভয়, আনন্দ, উত্তেজনা সব মিলিয়ে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে লাগল। ওর একবার মনে হল এখানে না এলেই বোধ হয় ভালো হত। আরেকবার মনে হল যে, ভাগ্যিস এসেছে।

অভী পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে বাথরুম থেকে বেরুল। বেরিয়েই বলল, ফাইন্। এবার তো চা-টা দিয়ে যাওয়ার কথা। লোকটা কি করছে বল তো? আলোও এসে গেছে।

বাবলি ঠোঁট উল্টে বলল, আমি কি করে বলব?

অভীই বলল, ঐ যে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

লোকটা ট্রে-সুদ্ধ চায়ের পট নামিয়ে রেখে গেল। নামিয়ে রেখেই একবার চকিতে তাকাল বাবলির দিকে। বাবলির কেমন গা-ছম্‌ছম্ করে উঠল। সেই ছমছমানি ঝেড়ে ফেলে ও চা তৈরি করতে লাগল।

অভী বলল, চিনি ক' চামচ জান তো?

বাবলি হাসল, বলল, জানি।

অভী কপট কৌতূহলের সঙ্গে বলল, তুমি কি সবই জান আমার সম্বন্ধে? কি আমার পছন্দ, কি অপছন্দ?

বাবলি চায়ের পেয়ালা অভীর হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, সব জানি না ; কিছু কিছু জানি।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে অভী বলল, রাতে বেশ গরম হবে বলে মনে হচ্ছে। আমি কিন্তু মশারি টাঙিয়ে শুতে পারি না—আর পাখাও ফুলস্পীডে না চালিয়ে শুতে পারি না। মেঘলা করেছে আকাশে, তাই এত গরম।

বাবলি উত্তর দিল না।

অভী একবারও জিজ্ঞেস করল না যে, মশারি না টাঙিয়ে শুলে বা পাখা ফুলস্পীডে চালালে বাবলির কোনো অসুবিধা হবে কি না ; হয় কি না।

অভীর বাবলি সম্বন্ধে এই স্বাভাবিক ও প্রাসঙ্গিক ঔৎসুক্যের অভাব বাবলিকে শুধু অবাকই নয়, একটু দুঃখিতও করল।

চা খেতে খেতে ও ভাবছিল যে, ও কোনোদিনও মশারি না টাঙিয়ে শুতে পারে নি। যতই গরম হোক না কেন। ঘরের কোণায় একটি মশাও যদি একবারের জন্যেও পিন্‌ন্ করে ওঠে তাহলেই নিছক টেনশনে ও মশা কামড়াতে পারে এই ভয়েই ওর সারারাত ঘুম হয় না। পাখা 'অন'-এ চালালে তো ওর নিঃশ্বাসই বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া ছোটবেলায় মা মারা যাবার পর থেকে বাবলি চিরদিনই একা ঘরে শুতে অভ্যস্ত। অন্য কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তির সুবিধা অসুবিধার সঙ্গে মানিয়ে চলা তার কখনও প্রয়োজন হয় নি। জীবনে এই প্রথম। এই সন্ধ্যেবেলা ওর হঠাৎ মনে হল যে, লক্ষ লক্ষ কোটি বিবাহিত মানুষকে স্ত্রী বা স্বামীর কতরকম সুবিধা-অসুবিধাই না মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়। চা-এর কাপ নামিয়ে রেখেই বাবলির হঠাৎই মনে হল যে, বিয়ে ব্যাপারটা বেশ কঠিন—বিয়ে মানেই হানিমুন নয়, গাড়ি চালানো স্বামীর পাশে বসে হু-হু হাওয়ায় বেড়িয়ে বেড়ানো নয়। এর মধ্যে যে এত সব সহজ অথচ জটিল জোড়-মেলানোর ব্যাপার আছে তা বাবলির জানা ছিল না। মনে মনে ওর কাকীমার প্রতি, ওর পরিচিত বিবাহিতা বান্ধবী ও আত্মীয়াদের প্রতি সম্মান বেড়ে গেল। মুহূর্তে ও ভাবল, আশ্চর্য। ওসব কথা কেউ ওকে বলেও নি। ওরও কখনও মনে হয় নি। সামান্য মশারি ও পাখা যে ব্যক্তিস্বাধীনতার পথে এতবড় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে কি করে, তা বাবলি ওর সমস্ত মেধা দিয়ে বুঝতে পারল না।

এটা সেটা নানা গল্প করতে লাগল ওরা দুজনে।

চা খাওয়ার পর, চৌকিদার চায়ের বাসন নিয়ে গেলে, অভী উঠে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পিছন থেকে এসে বাবলির গ্রীবায় আলতো করে চুমু খেল।

বাবলি শিউরে উঠল ভালো লাগায়। মনে মনে বলল, পারফেক্ট। ছোটবেলা থেকে যত ইংরিজি ছবি দেখেছে, গ্রেগরী পেক্ থেকে ওমার শরীফ তারা তাদের সমস্ত নায়িকাকে—সে লিজ টেলরই হোক আর অড্রে হেপবার্নই হোক ঠিক এইভাবেই চুমু খেয়েছে। এমন রোমান্টিক পুরুষালী কায়দায় সুন্দর আদরই ও আশা করেছিল অভীর কাছ থেকে। বড় ভালো লাগল বাবলির। ও মুখ নামিয়ে নিল ভালো লাগায়।

অভী বলল, পাহারাদারটা এখন থেকেই চুরি করতে শুরু করেছে—এই

সন্ধ্যেবেলাতে—রাত বাড়ালে কি যে করবে তা কিন্তু সে নিজেও জানে না।

বাবলি মুখ ঘুরিয়ে বলল, তুমি ভীষণ অসভ্য।

অভী দরজাটা খুলে দিতে দিতে বলল, তোমার যা ইচ্ছা, যতটুকু ইচ্ছা আমাকে বোল।

বাবলি জবাব দেয় নি। চুপ করে থেকে ভেবেছে যে, ও কোনো দিনও বাড়ির রান্নার ঠাকুরের কাছ থেকেও কিছু চেয়ে খায় নি। ও বড় অভিমানিনী। ওর নিজের ইচ্ছার বা অনিচ্ছার কথা কখনও মুখ ফুটে কাউকে বলে নি। বলবেও না কখনও। অভী যদি ওকে বুঝতে না পারে? কি ও চায় আর কি চায় না তা জানতে না পারলে বাবলির সমস্তটুকু বাবলিকে অভী কখনও বুঝবে না ; পাবেও না। কাছে থেকেও অভী তাহলে চিরদিন দূরেরই থেকে যাবে। যতটুকু অভী পাবে, তা বাবলির টুক্‌রো-টাক্‌রা।

বাবলির বড় ভয় হল ; অভী কি তাকে তেমন করে বুঝতে পারবে? যদি না পারে?

ওরা কথা থামালেই বাইরের ডুং-ডিং শব্দটা সমস্ত পরিবেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

বাবলি তাই আদুরে গলায় বলল, গল্প কর, তুমি কত কি জান, কত দেশ ঘুরেছ, গল্প কর না বাবা।

অভী বলল, গল্প করতে ভালো লাগছে না। এই সময় এই মুহূর্তটুকুকে দারুণ ভালো লাগছে। কিন্তু...।

—কিন্তু কি? বাবলি শুধোল।

ঝুমার জন্য মনটা খারাপ লাগছে। বড় ছোট লাগছে নিজেকে। একটু থেমে বলল, তোমার লাগছে না?

বাবলি মুখ নামিয়ে নিল। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

তারপর বলল, আমি তো ছোটই। তোমার মতো মহৎ তো নই—আমার নতুন করে ছোট লাগার কোনো কারণ নেই।

অভী উত্তর দিল না।

বাবলি বলল, চুপ করে কেন? কিছু বল।

বাবলির ভিতরটা শরীরের ভিতর, মনের ভিতর, এতক্ষণ, মানে চান করে ওঠার পর থেকে এই আসন্ন অভিসারের রাতের জন্যে উন্মুখ হয়েছিল। ওর অন্তরে শরীরে যে এত ফুটে-ওঠার অপেক্ষায় অপেক্ষমান দারুণ সুগন্ধি সব কুঁড়ি ছিল ও নিজেও কখনও জানে নি। একটু আগেই বাবলি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জানে বলে বিশ্বাস

করত। কিন্তু ও এখন এই মুহূর্তে জানছে যে, নিজেকে ও কখনোই সম্পূর্ণভাবে জানে নি, জানত না। কেউই কি তা জানে? জীবন যত এগোয়, যতই দিন যায়, পরতে পরতে জানাগুলো খুলতেই থাকে, খাঁচে-খোঁচে। পাড়েতে আঁচলাতে কত বিস্ময়, কত আশ্চর্য সব আবিষ্কার যে লুকিয়ে থাকে—আতরের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে, ন্যাপথলিনের উগ্র গন্ধের সঙ্গে তা বাবলি কখনও জানে নি। হীরের মতো মনের এক এক কোণে অন্য মনের এক এক কোণ থেকে আলো পড়লেই কত যে আলো ঝল্‌মলিয়ে ওঠে তা যতক্ষণ না ওঠে ততক্ষণ জানাও যায় না।

বাবলি ভাবছিল যে, একটু আগেও ও অন্য বাবলি ছিল। সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। ভালোবাসা, ভালো লাগার উত্তেজনায় আকুল কোনো পাপড়ি মেলা ফুলের মতো। অথচ অভীর এই একটা কথায় ওর ভিতরের শরীর মনের গোপন পাপড়িগুলি কার অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে যেন গুটিয়ে গেল, এমনভাবে গুটিয়ে গেল যে ওর মনে হল তাদের বোধহয় অনেকদিন আর চেষ্টা করেও খোলা যাবে না!

শরীর মনের কুলুপের চাবি হারিয়ে গেছে।

বাবলি শাড়ির আঁচলটা ভালো করে বুকের সামনে টেনে নিয়ে বসল, গ্রীবা ঢেকে। অভীকে যে আদর করতে অনুমতি দিয়েছিল তার জন্যে মনে মনে ধিক্কার দিল নিজেকে। ইম্ফলে আসার জন্য, ভুল লোককে ভুল করে ভালোবাসার জন্যে নিজেকে তিরস্কার করল মনে মনে।

হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে অভী বলল, তুমি কবিতা ভালোবাস?

—মানে? বাবলি নৈর্ব্যক্তিক গলায় শুধোল অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে।

—কবিতা ভালোবাসো কিনা জিজ্ঞেস করছি।

অভী সহজ গলায় আবার বলল।

—হঠাৎ কবিতার কথা? 'আশ্চর্য পতন'-এর কবিতার কথা বলছ?

অভী হেসে ফেলল। বলল, না। তারপর বলল, বরার্ট ফ্রস্ট আমার প্রিয় কবি। এই মুহূর্তে ফ্রস্ট-এর একটি কবিতা মনে পড়ছে খুব।

বাবলি বলল, ফ্রস্ট আমি বিশেষ পড়ি নি। তবে জওহরলাল নেহরুর দৌলতে ওঁর একটি কবিতা প্রায় সকলেই জানেন। কবিতাটির নাম মনে নেই—কিন্তু ঐ যে সব লাইন আছে না—প্রমিসেস্ টু কীপ ইত্যাদি!

অভী বলল, কবিতাটির নাম ঃ

Stopping by wood on a Snowy Evening কিন্তু এখন আমার অন্য একটি কবিতার কথা মনে পড়ছে ভীষণ।

—কি কবিতা? বাবলি শুধোল।

—The Road not taken! অভী বলল।

—কি কবিতাটি—শুনি?

অভী আবৃত্তি করল—

Two roads diverged in a yellow wood.
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth ;
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because...

এই অবধি বলতেই বাবলি ঝাঁঝিয়ে উঠল। এমনভাবে এর আগে ও অভীর সঙ্গে কখনও কথা বলে নি।

অভীর মনে এতদিন পরে এতকিছুর পরেও যে ওর সম্বন্ধে এখনও এত দ্বিধা আছে একথাটা বুঝতে পেরে ও অপমানিত বোধ করল।

বলল, এর পরের অংশ শোনবার ধৈর্য আমার নেই। সব কাজের পেছনেই কারণ একটা থাকে। কবির কারণ আর তোমার কারণ নিশ্চয়ই এক নয়। কিন্তু তোমার কাছে তো আমি কারণ শুধোই নি। নিজেকে আমার কারণে ছোট করছ কেন? ঝুমার কারণে ছোট হয়ে, হীন বোধ করে, তুমি যদি আনন্দিত হও সেইটেই আমার কাছে অনেক কারণ। কারণের বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি?

অভী হেসে উঠল, বলল, সবকিছুই তুমি বড় তাড়াতাড়ি পার্সোনাল করে ফেল। কবিতাটার শেষটা শোন। ভালো লাগবে। শোন ঃ

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence :
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less travelled by,
And that has made all the diference.

বাবলি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ডিফারেন্সও বুঝলাম, কিন্তু for good or for worse?

সে তো জানা যাবে ভালোই। তার আগে কি জানা যাবে?

বাবলি একটু পরে আপন মনে হেসে উঠল।

অভী বলল, হাসছ কেন?

আমারও একটা কবিতা মনে পড়ল। হঠাৎ।

—কি কবিতা? কার কবিতা? অভী শুধোল।

বাবলি বলল, বহুদিনের কবিতা—হুইটম্যানের—লিভস অব গ্রাস্—এর Song

of myself এর কটা লাইন।

কোন্ লাইন? উৎসুক গলায় অভী শুধোল।

বাবলি জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার তারাভরা রাতের আকাশে চেয়ে ভারি বেহিসাবী গলায় আবৃত্তি করল লাইন কটি ঃ

There was never any more inception then there is now,
Nor any more youth or age than there is now ;
And will never be any more perfection than there is now,
Not any more heaven or hell than there is now

লাইন কটি আবৃত্তি করতে করতে নিজের গলার আবেগ ও গভীরতায় বাবলি নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আবৃত্তির মধ্যে মধ্যেই ওর মনে হল ও জীবনে একটা বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ওর হঠাৎই মনে হল, আসলে কেউ কারো কাছে হারে না ; কাউকে হারায়ও না। হার যেটা আসল হার ; সেটা নিজের কাছেরই হার। বাবলি ভগবান নামক অদৃষ্ট, নিরাকার, কোনো বিশেষ ক্ষমতাবান পুরুষ অথবা নারীর উদ্দেশ্যে—যার অস্তিত্বে তার তেমন বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস কিছুই ছিল না—কৃতজ্ঞতা জানাল এ কারণে যে, সে নিজের কাছে কখনও হারে নি—নিজের বুকের মধ্যে হার স্বীকার সে কখনও করে নি—এ মুহূর্তেও করবে না।

ওর মনের মধ্যে ভাবনাটা দানা বাঁধতে-না-বাঁধতে অভী বলে উঠল, হুইটম্যানও আমার খুব প্রিয় কবি—

What will be will be well—for what is well,
To take interest is well, and not to take interest shall be well.

মাঝপথে অভীকে থামিয়ে দিয়ে বাবলি বলল, বাঃ, কী চমৎকার! কোন্ কবিতা এটা?

অভী অবাক হয়ে বলল, কেন, Leaves of Grass এই আছে—To think of time.

বাবলি সহজ হল এতক্ষণে। নিজের মনের গুমোট কাটিয়ে উঠে হাসল। বলল, তুমি বুঝি দেশী কবিদের কবিতা একেবারেই পড় না?

অভী কথাটার খোঁচা এড়িয়ে গিয়ে বলল, পড়তে কোনো আপত্তি নেই। তবে ইংরেজী কবিতাই বেশি পড়েছি। এটা দোষ বলে যেমন মানতে রাজী নই ; গুণ বলেও দাবি করি না।

বাবলি উত্তর দিল না কোনো।

ওর কেবলই মনে হচ্ছিল যে গতবার ইম্ফলে এসে এবং ইম্ফল ডিমাপুর যাওয়া অবধি সমস্তক্ষণ বাবলিই ওদের দুজনের আকাশে সূর্যের মতো দেদীপ্যমান ছিল। আপারহ্যান্ড ওরই ছিল। অভীকে তখন একজন ভালো কিন্তু বোকা-বোকা

হীনমন্যতায় ভোগা ছেলে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তারপর ওর বিষয়ে সবকিছু জেনে, অভীর সঙ্গে মিশে, তাকে নিজের হৃদয় প্রায় কিছুমাত্র বাকি-না-রেখেই সমর্পণ করে, এবং ইম্ফলে এসে ঝুমাকে দেখার পর থেকে অভীই এখন এই ছোট্ট আকাশে ঝক্‌মক্‌ করছে। ওকে এত বেশি বুদ্ধিদীপ্ত, এত বেশি আত্মবিশ্বাসী ও এতই উচ্চমন্যতায় ঘেরা বলে মনে হচ্ছে যে, ওকে বুঝি আর আগের মতো ভালো লাগছে না। মেয়েরা যাকে ভালোবাসে, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ; সেই ভালোবাসার জন মেয়েদের চোখে চিরদিনই ছেলেমানুষ। এবারে বাবলি লক্ষ্য করছে যে অভীর মধ্যের সেই ছেলেমানুষী নির্ভরশীল সত্তাটি যেন বিনা নোটিশে ক্লাস পালিয়ে কোথাও চলে গেছে। এমনকি প্রক্সি দেওয়ার জন্যেও তার ভিতরে অন্য কোনো দ্বিতীয় সত্তাকে উপস্থিত রেখে যায় নি।

বাবলি মনে মনে অভীকে বলল, যখন তুমি নির্দ্বিধায়, নিঃশর্তে আমাকে চেয়েছিলে একমাত্র আমাকেই ; তখন আমি সাড়া দিয়েছিলাম। আজ যখন তোমার মনে আমার সম্বন্ধে দ্বিধা এসেছে, তুমি আমার পাশে বসে, আমাকে আদর করতে করতে ঝুমার কথা ভাবছ তখন আমারও সেই নিঃশর্ত ভালোবাসা আমি ফিরিয়ে নেব। তুমি যত বড়ই হও না কেন, যত মেয়েই তোমাকে চাক না কেন, তুমি আমাকে প্রথমে হারিয়ে দিয়ে পরে দয়া করে জিতিয়ে দেবে এমন দান আমি চাই না। বাবলি চায় নি কখনও এমন দান। তুমি আমায় সম্পূর্ণ চেন না অভী।

অভী ভাবছিল ; বাবলির মনটা এর চেয়ে অনেক বড় ও উদার হওয়া উচিত ছিল। ভাবছিল, সব ছেলেরাই বোধহয় মনের দিক দিয়ে মেয়েদের চেয়ে স্বভাবত উদার হয়। ব্যতিক্রম হয়তো আছে কিন্তু এইটেই সাধারণ নিয়ম।

ঝুমার প্রতি যে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে, করা হল এবং বাবলির এই খারাপ ব্যবহারের দায়িত্ব যে অভীতেও বহুলাংশে বর্তাল একথা অভী অস্বীকার করতে পারে না। ইম্ফলের মতো ছোট জায়গায় যেখানে ঝুমার কোনো বন্ধু বান্ধব নেই, ভালো সিনেমা নেই হোটেলের আশেপাশে কোনো একা-মেয়ের পক্ষে হেঁটে বেড়াবার উপায় পর্যন্ত নেই ; সেখানে এখন ও কি করছে, কি ভাবে সময় কাটাচ্ছে, অভী না ভেবে পারল না।

অভী কিছুতেই বাবলির দিকে প্রসন্নতার সঙ্গে তাকাতে পারছিল না। বাবলিকে ওর বড় নীচ বলে মনে হচ্ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, ঝুমার সম্বন্ধে ওর মনে অন্য কোনো রকম অনুভূতি ছিল না—কিন্তু বাবলি আসার পর থেকে—বাবলি ঝুমার সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্প্রয়োজনীয়ভাবে খারাপ ব্যবহার করায়—ঝুমাকে ও এক নতুন আলোয় দেখতে আরম্ভ করেছে। সহানুভূতি, সমবেদনা, অনুকম্পা সমস্ত মিলিয়ে

এক দারুণ অনুভূতি। এর মানেও কি ভালোবাসা? অভী জানে না। কিন্তু ওর মনে বাবলির জন্যে যে উঁচু আসন ছিল সেই আসন থেকে বাবলি নিজেই ধুলোয় নেমে এসেছে তার অস্বস্তিভরা দীনতায়। এবং ঝুমা অভীর প্রতি তার অনাসক্তি ও বান্ধবীর প্রতি সৌজন্য এমন সংযমের সঙ্গে প্রকাশ করেছে যে, সে অনায়াসে উঠে এসেছে অনেক উঁচু আসনে, নিজের কোনো রকম চেষ্টা ছাড়াই।

মুরগীর ঝোলটা চৌকিদার ভালোই রেঁধেছিল।

মুগের ডাল, কড়কড়ে ক'রে আলুভাজা, মুরগীর ঝোল আর ভাত। সময় ওদের দুজনের বুকে বড় ভারী হয়ে ছিল। অভী নানা গল্প করছিল, মানে করার চেষ্টা করছিল। বাবলিকে হাসাচ্ছিল, ঝুমার কথা মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছিল; কিন্তু যতই চেষ্টা করছিল ততই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর অভী বলল, চল, একটু পায়চারি করি বাইরে।

বাবলি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল। যা ঘুটঘুটে অন্ধকার। চাঁদনী রাত হলে কথা ছিল।

—তবে? কি করা হবে এখন? অভী শুধোল।

বাবলি আবারও কাটা কাটা কথায় বলল, আমি ঘুমোব। আমার খুব ঘুম পেয়েছে।

—এত তাড়াতাড়ি? অবাক গলায় বলল অভী।

—তাছাড়া কি করার আছে এখানে? তুমিই বল?

—তা ঠিক। লজ্জিত গলায় অভী বলল। গলার স্বরে প্রকাশ পেল যে বাবলিকে এই লক্‌টাক্ লেকে এনে কষ্ট দেওয়ার জন্যে ও দুঃখিত।

বাবলি বলল, এখানে মসলা-টসলা পাওয়া যাবে না, না? না হলে পান হলেও চলত ফর্ আ চেঞ্জ।

অভী বলল, পানের দোকান আছে নীচে—তবে এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। তা ছাড়া এখানের পান তুমি খেতে পারবে না। মজা সুপুরী দিয়ে খায় ওরা—উৎকট গন্ধ। মসলাও নেই।

তারপর বলল, একটা সিগারেট খাও তার চেয়ে। মুখটা ভালো লাগবে।

বাবলি হাত বাড়িয়ে বলল, দাও।

অভী এগিয়ে এসে সিগারেটটা ধরিয়ে দিল বাবলিকে।

বসবার ঘর থেকে ওরা শোবার ঘরে এল।

এসেই বাবলি বলল, খাট দুটো এমন বিশ্রীভাবে জোড়া লাগানো। আলাদা করা যায় না?

অভী বাবলির চোখের দিকে চেয়েও চোখ নামিয়ে নিল।

তারপর বলল, দেখি।

চৌকিদারকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে টানাটানি করেও খাট আলাদা করা গেল না। পায়াতে স্ক্রু মেরে জোড়া লাগানো ছিল খাট দুটো।

অসহায়ের মতো অভী তাকাল বাবলির দিকে একবার। তারপরই অভীর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এল। কি ভাবল অভী সেই-ই জানে।

অভী বলল, এক কাজ কর। তুমি একা খাটে শোও, আমি শোফাতে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেব, আমার অভ্যেস আছে। আসলে তুমিই তো ভয় পাচ্ছ। নইলে তো দুজনে দু'ঘরে স্বচ্ছন্দে শোয়া যেত।

—সেটাই মুশকিল। বাবলি বলল। তারপর বলল, তুমি-ই খাটে শোও—আমি শোফায় শুচ্ছি।

শক্ত গলায় অভী বলল, না। তা হয় না। তুমি অতিথি।

—ক্ষণিকের অতিথি। বলেই মুখ ঘুরিয়ে নিল বাবলি।

অভী চোখ তুলে দেখল বাবলির চোখের কোণ যেন ভিজে উঠেছে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখল যে, শুধু আর্দ্রতাই নয়, তাতে আগুনও আছে।

বাবলি সিগারেটটা শেষ করে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল, আমি শুয়ে পড়লাম। বড্ড ঘুম পেয়েছে।

—যা ইচ্ছা। অভী বলল, আমি তো জোর করে জাগিয়ে রাখতে পারি না তোমাকে।

বাবলি দেওয়ালের দিকে মুখ করে, অভীর দিকে পিছন ফিরে শুয়ে পড়ল। স্যুটকেশে নাইটি এনেছিল, বুকের মধ্যে করে তার সঙ্গে অনেক সখ, কল্পনা, ভালোলাগা স্বপ্ন এসবও এনেছিল। কিন্তু শাড়ি ছেড়ে নাইটি পরার অবকাশ বা ইচ্ছা তেমন হল না। বুকের মধ্যের সুন্দর সব স্বপ্নগুলোকেও নিঃশ্বাস চাপা দিয়েই রাখতে হল।

অভী সোফায় বসে আর একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেটটা হাতে ধরে একদৃষ্টিতে বাবলির পিছন-ফেরা শায়িত শরীরের দিকে চেয়ে রইল।

বাবলি কালো হলে কি হয়, ওর গায়ের চামড়ায় ভারী একটা মসৃণ উজ্জ্বলতা আছে। আলোতে, বাবলির কোমরের উপরে রাখা হাতটাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

অভী ভাবছিল।

বাবলির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বাবলির প্রতি এক ব্যাখ্যাহীন ঘৃণায় ওর মন ভরে উঠল। অভীর মনে হল ঝুমা শুধু বাবলির চেয়ে বহুগুণ বেশি সুন্দরীই নয় শারীরিকভাবে—ঝুমার আত্মিক সৌন্দর্যই অনেক বেশি। বাবলির মতো নীচু,

ঈর্ষাকাতর মনের কাউকে স্ত্রী করার কথা ভাবতে পারে না অভী। এত কাছে থেকে, এই ঈর্ষাকাতর নোংরামির মধ্যে বাবলিকে হয়তো না দেখলেই ভালো হত। বাবলি সম্বন্ধে দুর্বলতাটা তবুও হয়তো বেঁচে থাকত ওর মনে।

ইচ্ছা করলে, এবং একটু অভিনয় করলে, আজ রাতে এই প্রসন্নতার মধ্যে একটি কুমারী শরীরের স্বাদ পেতে পারত অভী। এ পর্যন্ত অভী কোনো নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে নি। এমনকি কোনো প্রাপ্তবয়স্কা নারীর শরীর অনাবৃত অবস্থায়ও দেখে নি। কিন্তু যে-সব পুরুষ শরীরকে মন থেকে বিযুক্ত করে দেখে ও শরীরকে মৃতদেহের মতো করে পেতে চায় তাদের দলে পড়ে না অভী। মনের ভালোলাগা সঙ্গে না নিয়ে অন্য শরীরে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না অভী। সে যে শরীরই হোক না কেন।

কিন্তু বাবলি বড় মোহময় ভঙ্গিমায় শুয়ে আছে। সুন্দর সুগঠিত পিঠ—টেনিস খেলে খেলে বাবলির চেহারাতে বড় মিষ্টি একটা বাঁধুনি এসেছে। কোমরটার কাছের উৎরাইয়ে ঢেউ খেলে গেছে। তারপরেই উঁচু হয়ে উঠেছে সুডৌল নিতম্বের চড়াই।

অভী সমস্ত শরীরে হঠাৎ বড় একটা জ্বালা অনুভব করল। এক অননুভূত অস্বস্তি। অভীর ইচ্ছা হল বাবলির কাছে যায়—ওর পাশে শুয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে—ওর ছাই-ছাই কবুতরী বুকে মুখ ডুবিয়ে বলে, বাবলি, আমাকে ক্ষমা কর—ঝুমার কথা আমি আর মুখেও আনব না। মনে তো নয়ই।

খুব দ্রুত অভী নিজের কাছে হেরে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে সম্পূর্ণভাবে হেরে গেল নিজের কাছে।

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ছুঁড়ে ফেলে ও সোফা ছেড়ে ধীরে ধীরে বাবলির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। তারপর খাটে উঠে বাবলির কাছে এল। ও জানত যে, বাবলি জেগে আছে ; জেগে থাকবে। ও এও জানত যে, আজ সারারাত ওদের দুজনের কেউই ঘুমোতে পারবে না, যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন কারণে। অভী বাবলির বাহুতে, যেখানে ব্লাউজের হাতটা শেষ হয়েছে, সেখানে হাত রাখল।

বাবলি চোখ খুলে, মুখ ঘুরিয়ে চকিতে বলল, কি? কি চাও অভী?

বাবলির গলায় আনন্দ, স্বস্তি ; জয়ের স্বর ঝরে পড়ল। তার সঙ্গে পরাজয়ের সুরও।

অভী হঠাৎ কি যেন দেখতে পেল বাবলির চোখে। যা একমাত্র মেয়েদের চোখেই লুকানো থাকে।

সাপ দেখার মতো অভী সেই চোখ দেখে চমকে উঠল।

পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল অভী। খাদের মধ্যে পড়ে যেতে যেতে বেঁচে

গেল একটুর জন্যে।

অভী বলল, কিচ্ছু চাই না। তুমি কতখানি রাগ করেছ তাই দেখলাম।

তারপরেই কথা ঘুরিয়ে বলল, জ্বরের মাত্রার মতো রাগের মাত্রা মাপার জন্যেও একটা মিটার-টিটার থাকলে ভালো হত। তাই না?

বাবলি হাসল না।

বলল, আমার কিন্তু সত্যিই ঘুম পেয়েছে। বিশ্বাস কর।

পাছে ও নিজের কাছে আবারও হেরে যায়, সেই ভয়ে বাবলির কাছ থেকে সরে এল অভী। বাবলিকে পাহারা দেওয়ার কথা ভুলে গিয়ে নিজের মধ্যের আদিম, পুরুষালি ; নারীর শরীরের প্রতি স্বাভাবিক লোভকে পাহারা দেওয়ার জন্যে ও ওর নিজের বুকের মধ্যের সমস্ত শুভ বোধগুলোকে জাগিয়ে তুলল। ওর রুচি, ওর শিক্ষা, ওর অসাধারণত্বর গর্বকে জাগিয়ে তুলে প্রত্যেকের হাতে একটা করে সম্মানের তরোয়াল ধরিয়ে দিয়ে মনে মনে বলল, আমি একটু বেচাল হয়েছি তো অমনি আমাকে কেটে ফেলো তোমরা। বুঝেছ?

আরও একটা সিগারেট খেয়ে, পাখাটাকে অন্ করে দিয়ে, বড় বাতি নিবিয়ে দিয়ে ঘেরাটোপের মধ্যের টেবল-বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল অভী সোফার উপর।

বাবলি কথা না বলে, পায়ের কাছে রাখা লাইঝাম্পিটাকে তুলে নিয়ে আপাদমস্তক মুড়ে শুয়ে পড়ল। অভীকে জোরে পাখা চালাবার জন্যে কোনোরকম অনুযোগ জানাল না। বাবলির দুচোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরতে লাগল। এত জল চোখের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে ছিল বাবলি জানে না। কিন্তু এত কান্না বহুদিন ও কাঁদে নি।

পাখাটার শব্দ ছাপিয়ে বাইরের হ্রদ থেকে ডুং-ডিং-ডিং-ডিং শব্দগুলো গম্ভীর জলতরঙ্গের মতো বাজতে লাগল। বাবলির মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে গেল।

বাবলির ছোটবেলার কথা মনে হতে লাগল। মায়ের কথা। মায়ের মৃত্যুর কথা। বাবার কথা। ওর সমবয়সী মাসতুতো বোন পরমার বিয়ের কথা—গতবছরে। পরমার স্বামী সুজয় ছেলেটি বেশ—কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়র বোম্বের কোন ফার্মে যেন কাজ করে। পরমা কি সুখী হয়েছে? বিবাহিত জীবনের সুখ কি বাইরে থেকে কাউকে দেখে বোঝা যায়? পরমা আর সুজয়কে খুব সুখী বলে মনে করত বাবলি। এবার ওরা দিল্লি ফিরলে ভালো করে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করবে। পরমার নাকি বাচ্চা হবে। বাচ্চা হওয়া মানেই কি ধরে নিতে হবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দারুণ সুখের? কত কি জানত না, বুঝত না, ভাবত না বাবলি। এই ইম্ফলের একটা দিন, ঝুমার মতো, অভীর

মতো taken for granted ছেলের আশ্চর্য ব্যবহার কত কি শেখাল বাবলিকে। জীবনে কোনো কিছুই বোধ হয় taken for granted নয়। কোনো সম্পর্কই নয়। প্রতিটি সম্পর্ককেই তিল তিল করে গড়তে হয় বুঝি প্রতিদিন—এই গড়ার চেষ্টা না থাকলেই বুঝি তা ভেঙে পড়ে, ফিকে হয়ে যায় ; বাবলি ভাবছিল। কিন্তু পুরুষ জাতটাই বড় বাজে। অভীকেও রোম্যান্টিক ভেবেছিল, ভালো ভেবেছিল, কিন্তু এখন দেখছে সব পুরুষই এক। সেই সমারসেট মমের মিস স্যাডি টমসনের গল্পের মতো—ওরও বলতে ইচ্ছা করছে—পুরুষমাত্রই শুয়োর। বড় নোংরা, বড় আনরোম্যান্টিক শরীরসর্বস্ব ওরা। ঝুমার শরীরটাই দেখল অভী ; আমার মনটা দেখতে পেল না।

ঘুম কারোরই হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু শেষ রাতের দিকে অভীর ক্রমাগত পাশ ফেরার উশ্‌খুশ শব্দ, বাবলির চুড়ির রিনরিন সবই থেমে গেল। ওরা দুজনেই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

নাগাপাহাড়ের ঘন জঙ্গলের ভিতর মিথুংদের সবে ঘুম ভেঙেছিল। বড় বড় পাহাড়ী দাঁড়কাক কর্কশ গলায় ডাকাডাকি শুরু করেছিল। অভী চোখ খুলল। চোখ খুলেই দেখতে পেল বাবলি অকাতরে ঘুমোচ্ছে। বড় করুণ দেখাচ্ছে বাবলিকে। লাইঝাম্পিটা সরে গেছে। ডান পায়ের হাঁটু অবধি দেখা যাচ্ছে বাবলির—শাড়ি সরে গেছে।

অভী উঠে বসল। উঠে বসে বাবলির খাটের পাশে এসে দাঁড়াল। বাবলির দু'চোখের কোণে কান্নার দাগ—গাল বেয়ে জল পড়েছে, সমস্ত মিলে মিশে মা-মরা বাবলিকে বড় অসহায় বলে মন হল অভীর। হঠাৎ, একেবারে হঠাৎই ওর বুকের মধ্যেটায় কি যে মুচড়ে উঠল। গলার কাছে একরাশ অনামা কষ্ট দলা পাকিয়ে উঠল। অভী যেন সেই মুহূর্তেই প্রথম বুঝতে পারল যে, বড় আশা করে, বাবলি ওর কাছে এসেছিল। ওর ওপর বাবলি তার সমস্ত সমর্পণে বড় অসহায়ভাবে নির্ভর করেছিল। সেই নির্ভরতার, সেই আশ্বাসের কোনো দাম দেয় নি অভী।

অভী এই প্রথম ভোরে ভেবেই পেল না কি করে ও এত নিষ্ঠুর হল—কোন্‌ দুর্বুদ্ধিতে ভর করে এমন নিষ্পাপ সরল সহজ মেয়েটার সঙ্গে এমন কঠিন ব্যবহার করল কাল রাতে?

অভী ডাকল, বাবলি, এ্যাই বাবলি!

বাবলি সাড়া দিল না।

অভী খাটে উঠে ওর বুকের মধ্যে এমনভাবে ঘুমন্ত বাবলির আড়ষ্ট শরীরটাকে টেনে নিল যে, বাবলি ঘুমের মধ্যে চমকে উঠল। চম্‌কে উঠে ওর চোখের সামনে

অভীকে দেখে ওর সমস্ত শরীরে অভীকে অনুভব করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

অভী বলল, কাঁদে না, লক্ষ্মী সোনা, আমি খুব খারাপ, ভীষণ খারাপ ; আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও।

বাবলি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলছিল, আমি খারাপ, আমি দেখতে ভালো না, তুমি তো সবই জানতে, সব জেনেশুনেও আমার সঙ্গে এমন করলে কেন? আমি তোমার কি করেছিলাম?

অভী চুমুতে চুমুতে বাবলির সব কান্না শুষে নিল। বলল, আর কখনও করব না; তুমি দেখো, আমি আর কখনও ভুল বুঝব না তোমাকে।

প্রথম ভোরে এক নতুন সুগন্ধি রাতের জন্ম হল। সেই রাত অবার কখন ভোর হবে তা ওরা জানে না। দুটি সুস্থ, শুচি, প্রেমবিহ্বল মানব-মানবী তাদের দুজনকে দুজনে এক আশ্চর্য আনন্দের মধ্যে আবিষ্কার করল। আমলকী বনে হরিণ-হরিণীর মতো তারা খেলে বেড়াতে লাগল। হারিয়ে যেতে লাগল, হারিয়ে দিতে লাগল, ধরা দিল নিজেকে, খুঁজে পেল অন্যকে।

চৌকিদার বোধহয় অনেকবার ধাক্কাধাক্কি করেও শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে দুপুরের জন্যে যা-খুশি তাই রান্না চাপিয়ে দিয়ে বাবুর্চিখানার সিঁড়িতে বসে হুঁকো খাচ্ছিল।

এমন সময় একটা ট্যাক্সি এসে ঢুকল ফটকের মধ্যে।

ঝুমা আর বাবলির কাকুমণি নামলেন ট্যাক্সি থেকে। নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন।

কাকা বললেন, কই ঝুমা, ওরা কি গায়েব হয়ে গেল না কি?

ঝুমা হেসে বলল, গাড়ি তো রয়েছে—গায়েব হলেই হল? বোধহয় হাঁটতে-টাটতে বেরিয়েছে।

চৌকিদারের মুখে সাহেব মেমসাহেব ঘুম থেকেই ওঠে নি শুনে কাকা ঘড়ি দেখলেন। তারপর ঝুমাকে বললেন, আমার ঘড়িটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। ক'টা বেজেছে দেখত ঝুমা।

—পৌনে একটা।

—তবে তো ঘড়ি ঠিকই আছে।

ঝুমা হাসল। বলল, ঘড়ির কি দোষ?

—তা ঠিক। কাকা বললেন।

তারপর ভাবলেন, বিয়ের পর উনি নিজে কি করতেন, টেবল ঘড়িটাকে উপুড় করে খাটের তলায় রেখে দিতেন।

পরক্ষণেই ভাবলেন, কিন্তু এদের তো বিয়ে হয় নি। এরা যে দেশটাকে আমেরিকা করে ফেলল।

অভী চোখ মেলে বলল, এ্যাই! আরো ঘুমোবে? বাইরে অনেক বেলা।

—হোক! বাবলি বলল।

—হোক। অভী বলল, বাবলির ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে।

এমন সময় দরজায় কে যেন দমাদ্দম করে ধাক্কা দিল।

বাবলি একলাফে উঠে জামাকাপড় পরতে লাগল। ভয়ে উত্তেজনায় ও একেবারে চুপসে গেল।

অভী তাড়াতাড়ি করে পায়জামা পাঞ্জাবি পরে নিতে নিতে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, কার কি? তুমি আজ বাদে কাল আমার স্ত্রী হবে। হবে কি? হয়ে তো গেছই।

অভী দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, কে?

ওপাশ থেকে জবাব এল, তোমার যম।

বাবলি চম্‌কে উঠল। কিন্তু গলাটা খুব চেনা চেনা মনে হলেও, চিনতে পারল না।

অভী দরজা খুলে একটা পাল্লা ফাঁক করল।

বাবলি সেই আধখোলা দরজা দিয়ে দেখল একটা লোমশ হাত এগিয়ে এসে অভীর হাত ধরল। তারপর হাত ধরেই অভীকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গেল।

পরমুহূর্তে ঝুমা দরজা ঠেলে হৈ হৈ করে ঘরে ঢুকেই খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, কী পাজীরে তুই বাবলি! এই জন্যেই আমাকে নিয়ে আসতে আপত্তি ছিল?

বাবলির মুখ কঠিন দেখাল।

বলল, তোর সঙ্গে কে? পুলিশ?

ঝুমা তখনও হাসছিল।

বলল, পুলিশ নয় ; শুনলি না, যম। আমি তোকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। শিগ্‌গিরি বাইরে আয়।

—আমি এখনও মুখ ধুই নি। তৈরি হই নি। বাইরে যেতে পারব না এখন।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বলেই, ঝুমা আবার হাসল।

ঝুমা বলল, সব পরে হবে, এক্ষুণি বাইরে আয়।

ঝুমার সঙ্গে বসবার ঘরে ঢুকেই কাকুমণিকে দেখে বাবলি একদৌড়ে ভিতরে পালিয়ে এল।

কাকা ওখান থেকে হাঁক ছাড়লেন, ঝুমা, ধরে নিয়ে এস তো এক নম্বর কাল্‌প্রিটকে।

ঝুমা আবার ধরে নিয়ে এল বাবলিকে।

কাকা বললেন, ভেবেছিস্ কি তোরা? এটা কি আমেরিকা?

তারপর অভীর দিকে ফিরে বললেন, তুমি যে আমাকেও হার মানালে হে ছোকরা। তোমাকে তো ভারতরত্ন দিতে হয়। চল এবার। বিয়ে করার মজা কত বুঝবে হাড়ে হাড়ে। ভদ্রলোকে বিয়ে করে? বিয়ে করার আর মেয়ে পেলে না? এমন বিচ্ছু মেয়েকে কেউ বিয়ে করে?

বাবলি ঝুমার দিকে তখনও কঠিনভাবে তাকাচ্ছিল।

হঠাৎই বাবলি কাকুমণির দিকে ফিরে বলল, কিন্তু তুমি এখানে? কি করে? ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছি না।

—কি করে আবার? তোমাদের ম্যাচমেকার এই যে ঝুমা দেবী তিনিই সব অনর্থের মূল। আচ্ছা, এমন কথাও কেউ টেলিফোনে বলে? আমাকে কাল দুপুরে ট্র্যাঙ্ক-কলে বলল, বাবলি এসেই প্রচণ্ড জ্বরে পড়েছে, একশ পাঁচ জ্বর—কালকে সকালের ফ্লাইটেই চলে আসুন। তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল যে, যে মেয়ে সুস্থ অবস্থায় বাড়ি থেকে সকালে বেরুল—দুপুরের মধ্যে তার একশ পাঁচ জ্বর হওয়া সম্ভব নয়। জ্বর তো আর জেট প্লেন নয়।

তারপর ঝুমার দিকে চেয়ে বললেন, কিন্তু তুমি যা ভেবেছিলে ঝুমা ; সব ভুল। এখন তো নিজের চোখেই দেখছ।

ঝুমা হাসছিল। ও মুখ নামিয়ে বলল, তাই-ই তো দেখছি। আসলে এসব হৃদয়-টিদয়ের ব্যাপার, কাকা, আমি কিছুই বুঝি না।

চা খেতে খেতে কাকা বিস্তারিত বললেন। ঝুমা এয়ারপোর্টে আনতে গেছল কাকাকে।

ঝুমার ধারণা হয়েছিল যে, অভী ও বাবলি যেমন অসিলেটিং টাইপ ও ছেলেমানুষ ; তাতে ওদের সম্পর্কটা ঝুমার এখানে থাকার কারণেই চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। কাকা না এলে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যেত। এবং সেই কেলেঙ্কারির জন্যে ঝুমাই দায়ী থাকত সারাজীবন।

কাকা বললেন, দেখলে তো ঝুমা, এসেই বরং কেলেঙ্কারিটা বাধালাম। থাকগে—আমি তো কালই চলে যাচ্ছি—তুমিও তো আমার সঙ্গেই যাচ্ছ। তাই—ই না ঝুমা?

ঝুমা বলল, হ্যাঁ।

বাবলি ধরা-পড়া গলায় বলল, আমার একা ঘরে শুতে ভয় করল—তাই...।

কাকা বললেন, ফারস্ট ক্লাস। ন্যাকামিতে তুই তোর কাকীমাকেও হার মানালি।

তারপর বললেন, ঝুমা পঞ্জিকাটা?

ঝুমা হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা পঞ্জিকা বের করল। তারপর ভালো করে দেখে বলল, মাঘ মাসের প্রথমেই যে দিন?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। কত তারিখ? কাকা বললেন।

—পাঁচ।

—বেশ! ঐ দিনেই হবে। তবে আজ থেকে কতদিন হল?

—প্রায় মাস দুয়েক। ঝুমা বলল।

কাকা অভীর দিকে ফিরে বললেন, আশা করি এই দু'মাসের মধ্যে আবার কোনো বিঘ্ন-টিঘ্ন ঘটিয়ে বসবে না। লান্ডান স্কুল অব ইকনমিক্সে সব কিছু শেখায় না, বুঝেছ?

তারপরই বাবলির দিকে ফিরে বললেন, আমার নেকুপুষুমুনু আদুরে মেয়ে কি বলে?

বাবলির কান লাল হয়ে উঠল।

কাকা বললেন, ভয় নেই কোনো, এক আমি আর ঝুমাই জানলাম এসব কুকীর্তির কথা—ঘটক আর যে কন্যাসম্প্রদান করবে যে—কন্যার বাবা অথবা পাত্রের দাদার কানে এসব যাবে না, এটুকু ভরসা আমার উপর করতে পারো।

কাকা চা-টা খেয়ে বললেন, জায়গাটা একটু সার্ভে করে আসি। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

অভী চান করতে গেছিল।

ঝুমা আর বাবলি বাংলোর বসার ঘরে বসেছিল।

ঝুমা হাসতে হাসতে বলল, কি রে বাবলি? এখনও কি রাগ করে থাকবি আমার উপর?

বাবলি মুখ তুলল। ঝুমার হাতটা নিজের হাতে নিল।

আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় ওর চোখে জল এসে গেল।

বাবলি বলল, তুই আমাকে বড় ছোট করে দিলি ঝুমা। তোর সম্বন্ধে লোকে যা বলত, তাই শুনেছিলাম ; বিশ্বাস করেছিলাম।

ঝুমা গম্ভীর গলায় বলল, লোকে তো কতকিছুই বলে রে! আমি বড়টড় নই; ভালোও নই। যা রটে ; তার কিছু তো বটে।

তারপর একটু থেমে বলল, আসলে কি জানিস, একজন মেয়ে হিসেবে কাউকে ভালোবেসে, কারো উপর মনেপ্রাণে নির্ভর করার পরও, সামান্য ভুল বোঝাবুঝির জন্যে যখন একটা জীবন নষ্ট হয়ে যেতে বসে, নষ্ট হয়ে যায়—তখন বড় লাগে রে।

ভুল বোঝাবুঝির খেসারত আমি আমার জীবন দিয়ে দিয়েছি। আমি জীবনে অনেক কিছু পেয়েছিলাম রে বাবলি,—অনেক পুরুষের স্তুতি, ভালোবাসা। কিন্তু ভালোবাসা পাওয়া আর ভালোবাসা ধরে রাখা এক নয়। আমি অনেক পোড়-খাওয়া মেয়ে। আমার জন্যে একজন আত্মহত্যা করেছিল। তুই জানিস। সেও ভুল বোঝাবুঝি। আমার এখন সবই সয়। আমার যা সয় ; তোর তো কখনও সইত না। আমার যা সইবে—তোর পক্ষে তা কল্পনা করাও মুশকিল।

তারপর একটু থেমে বলল, আমি বড় কিছুই করি নি। তোর মধ্যে আমাকেই দেখতে পেয়ে হয়তো আমি নিজেকেই এমনি করে বাঁচাতে চেয়েছিলাম।

অভী চান করে এল।

বাবলি বলল, তুমি ঝুমার কাছে বোস। আমি চান করতে যাই।

অভী এসে ঝুমার পাশে বসল।

ঝুমা খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চেয়েছিল। দুপুরের রোদে লকটাক হ্রদের জল রুপোর মতো চিক্‌চিক্ করছিল। নাগা ও মিজো পাহাড়শ্রেণীকে ধুঁয়ো ধুঁয়ো দেখাচ্ছিল।

অভী ডাকল, ঝুমা।

ঝুমা বলল, উঁ।

অভী ঝুমার হাতটা ওর নিজের হাতে টেনে নিয়ে বলল, ঝুমা, শোন।

ঝুমা যেন অনেক দূরে চলে গেছিল।

ঝুমা যেন অনেক দূর থেকেই বলল, অভীদা, বাবলিটা ভারি সরল মেয়ে ; ভালো মেয়ে, ওকে চিরদিন ভালোবেসো।

অভী আবার বলল, ঝুমা, একটা কথা শোন।

ঝুমা মুখ না ফিরিয়েই বলল, আমাকে যদি তোমার কিছুমাত্র ভালো লেগে থাকে—তবে সেই ভালো লাগাটা আর আলাদা করে রেখ না। আমার জন্যে যাই তোমার মনে থাকুক না কেন, যদি আদৌ কিছু থাকে, তবে সেটুকুকেও মিশিয়ে দিও। বাবলির মধ্যেই থেকে যাব আমি তোমার কাছে চিরদিন।

এটুকু বলেই, অভীর দিকে মুখ ফিরিয়ে ঝুমা একটু হাসল, বলল, কথা দিচ্ছ তো অভীদা?

অভী আশ্চর্য চোখে ঝুমার মুখে চেয়ে থাকল।

ঝুমার মুখের সৌন্দর্যের গভীরে কোথায় যেন কোনো এক গভীরতর মানসিক সৌন্দর্যের উৎস ছিল। ওর সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই অভী তার আভাস পেয়েছে—কিন্তু আজ সকালে সেই সৌন্দর্যকে যেন পরম সত্যের মধ্য দিয়ে নিজের

বুকের অন্তস্থলে উপলব্ধি করল।

অভী কোনো কথা বলল না।

অভীর দু'চোখের সামনে বসে থাকতে থাকতে ঝুমার মুখের হাসিটা বিকেলের পড়ন্ত রোদের মতো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল। কিন্তু সে হাসি সম্পূর্ণ মুছে যাবার আগেই ঝুমা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, মুখে কিছুই না বলে।

তারপর অভীকেও আর কিছু বলার বা শোনার সুযোগ না দিয়ে, কাঁকর-ছড়ানো পথে কির্‌কির্‌ শব্দ তুলে গেট পেরিয়ে অভীর চোখের সামনে থেকে ফেড্‌-আউট করে গেল।

বাবলি মুখে সাবান দিয়েছিল। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে চোখ পরিষ্কার হতেই ও বাথরুমের জানলা দিয়ে দেখতে পেল, ঝুমা বাংলোর গেটের পাশে একটা রাধাচূড়া গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে লক্‌টাক্‌ হ্রদের দিকে চেয়ে আছে।

হঠাৎ বাবলির মনে পড়ল যে, আজ মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষাতেও ঝুমা বাবলিকে জিতিয়ে দিয়ে কত অবহেলায় বাবলিকে আবার ও হারিয়েই দিল।

বাবলি বুঝতে পারল যে, এ হার স্বীকার না করে ওর উপায় নেই। বুঝতে পারল যে, জীবনে প্রত্যেক মানুষকেই এক বা একাধিক পরীক্ষায় হারতেই হয়।

BOIRBOI.NET